ইউনিট
৪

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রম

ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ এবং অবহেলিত অসুবিধা গ্রহণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এরই প্রেক্ষাপটে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের কল্যাণে জন্যে বিভিন্ন ধরণের সমাজসেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই ইউনিটের মাধ্যমে শহর জনগোষ্ঠির ও গ্রামীণ গোষ্ঠির জন্যে সরকার কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন শিশুদের উন্নয়নের স্বার্থে প্রতিবন্ধীদের পূর্নবাসনের জন্যে এবং সর্বোপরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে সমাজসেবামূলক কোন ধরণের কার্যক্রম সরকারি পর্যায়ে ব্যবহার বাস্তবায়ন হচ্ছে তার একটি পরিচিতি ও বিবরণ পাওয়া যাবে।

পাঠ – ১ ঃ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি বর্ণনা দিতে পারবেন—

☞ বাংলাদেশের সরকারি সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বিবর্তন/পটভূমি

৪.১ কর্মসূচির বিবর্তন

আমাদের দেশে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিকে ১৯৪৩ সালে সর্ব প্রথম ৪টি সরকারি এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি সেবামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত হতে পাকিস্তান বিভক্তির পর উদ্ভূত সামাজিক সমস্যা সমাধান ও দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রন করার জন্যে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৫ সালে ঢাকার কায়েতটুলিতে পরীক্ষামূলকভাবে শহর সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে উদ্ভূত জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্যে জাতিসংঘের কাছে আবেদন করেন। তৎকালীন সময়ে জাতিসংঘর একটি বিশেষজ্ঞ দল পাকিস্তানে আগমন কারেন এবং ১৯৫২-৫৩ সালে ব্যাপক অনুসন্ধান করে সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহন ও তা পরিচালনায় দক্ষকর্মী প্রশিক্ষণের সুপারিশ করেন। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকার ১৯৫৩ সালে ৩ মাস ব্যাপি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেন সমাজক্যাণ বিষয়ের উপর। এরপর বিশেষজ্ঞ টিম মূলত ২টি কর্মসুচি গ্রহনে সরকারকে পরামর্শ দেয়- (১) শহর সমষ্টি উন্নয়ন (২) চিকিৎসা সমাজকর্ম।

উপরোক্ত ২টি কর্মসূচি প্রাথমিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে শহর সমাজসেবা উন্নয়ন জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, এতিমখানা কার্যক্রম, চিকিৎসা সমাজকর্ম কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে ১৯৬১ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের সার্বিক প্রশাসনিক দায়িত্ব উক্ত দপ্তরের ওপর দেয়া হয়। সরকারি সমাজকল্যাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মীদের প্রশিক্ষণদানের জন্য আন্তঃচাকরি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট যার নাম বর্তমানে সমাজসেবা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনতা লাভ করার প্রেক্ষিতে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পূর্নগঠনসহ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ মহিলা শিশুদের পূর্নবাসনের লক্ষ্যে এবং ব্যাপক ভিত্তিক সমাজক্যালমূলক কার্যক্রম গ্রহনের জন্যে সরকার জনশক্তি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরকে উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে এনে সমাজকল্যাণ বিভাগ নামকরণ করা হয়। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক পুনঃবিন্যাস কমিটির সুপারিশ ক্রমে সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রশাসনিক কাঠামো প্রসারণ করে এর নাম সমাজসেবা অধিদপ্তর রাখা হয়। বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের

অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশের সামগ্রিক সরকারি বেসরকারি সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৪৩ সালে ৪টি সরকারি এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি সমাজকল্যাণ কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তী ১৯৪৭ সালে ভারত থেকে পাকিস্তান বিভক্তির পর পাকিস্তান সরকার, সরকারি পর্যায়ে ২টি সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে পাকিস্তান হতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ব্যাপক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণের জন্যে আলাদাভাবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্যে গৃহীত সকল সরকারী সমাজসেবামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের ৬৪টি জেলা এবং ৩৬০টি উপজেলায় সমাজসেবামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী (নৈব্যক্তিক)

১) কোন কার্যক্রমের মাধ্যমে এদেশে সর্বপ্রথম সরকারি সমাজসেবামূলক কর্মসূচি চালু হয়?
ক) বেবীহোম খ) শহর সমাজ সেবা
গ) চিকিৎসা সমাজকর্ম ঘ) এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে
উত্তর ঃ (ঘ)

২) শহরসমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পটি কত সালে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহন করা হয়?
ক) ১৯৫৩ খ) ১৯৪৩
গ) ১৯৫৫ ঘ) ১৯৬৫
উত্তর ঃ (গ)

৩) বাংলাদেশে কোন মন্ত্রণায়য়ের অধীনে সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়?
ক) শিশু ও মহিলাকল্যাণ মন্ত্রণালয় খ) স্বস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ঘ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
উত্তর ঃ (গ)

৪) সমাজকল্যাণ বিভাগের নাম পরিবর্তন করে বর্তমানে কি রাখা হয়েছে?
ক) সমাজসেবা একাডেমি খ) সমাজসেবা পরিদপ্তর
গ) সমাজসেবা অধিদপ্তর ঘ) সমাজকল্যাণ দপ্তর
উত্তর ঃ (গ)

রচনাবলী প্রশ্ন

ক) বাংলাদেশের সরকারি সমাজসেবা কর্মসূচির বিবর্তন সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
উত্তর ঃ (৪.১)

পাঠ -২ ঃ গ্রামীণ সমাজ সেবা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজসেবার পটভূমি;
- ☞ গ্রামীণ সমাজসেবার সংজ্ঞা ও লক্ষ্য;
- ☞ গ্রামীণ সমাজসেবার বৈশিষ্ট্য ও গুরত্ব;
- ☞ গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্পের কর্মসূচি।

৪.২.১ ঃ

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশ একটি গ্রাম প্রধান দেশ। এদেশে প্রায় ৮৫,৬৫০টি গ্রাম আছে। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৫% গ্রামে বসবাস করে। গ্রামই হল দেশের উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্র। পাকিস্তান আমল থেকে গ্রামগুলো এক করুণ ও নাজুক অবস্থা বিরাজ করছে। গ্রামের অধিকাংশ লোক চরম দারিদ্র ও নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। যেমন- বেকারত্ব জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, দারিদ্রতা, ক্ষুধা, অজ্ঞতা, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা, কুসংস্কার, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি হাজারো সমস্যায় জর্জরিত আমাদের গ্রামাঞ্চল। বিশুদ্ধ পানীয় ও পয়ঃনিস্কাশনের অভাবে আমেয়শা, ডায়রিয়া, কলেরা, আর্সেনিক রোগ গ্রামের মানুষের নিত্যসঙ্গী বেশীর ভাগ গ্রাম বিদ্যুৎহীন । বেশির ভাগ গ্রামের লোক অপরের উপর নির্ভরশীল। মা মৃত্যু হার ও শিশু মৃত্যুহার গ্রামে অনেক বেশি। প্রতি বছর বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গণ, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় এবং জনগণের জীবন-যাপন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

দেশের এই সমস্যাগ্রস্থ ব্যাপক জণগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যে বিশেষ করে সমস্যাগ্রস্থ গ্রাম্য জনগোষ্ঠিকে টার্গেট করে সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৭৪ সালে একটি ব্যতিক্রম ধর্মী ও কল্যাণমূখী প্রচেষ্টা গ্রহণ করে যার নাম- Rural Social Service (R.S.S) বা গ্রামীণ সমাজসেবা। গ্রামের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ভূমিহীন ও বর্গাচাষী অসহায় মহিলা, বেকার যুবক ও নিরাপত্তাহীন বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, বেকার ইত্যাদি শ্রেণীর পূর্নবাসন ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্যে এই প্রকল্পটি গ্রহন করেছে। ১৯৭৪ সালে এ প্রকল্পটি ৯টি থানায় পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষামূলক সাফল্যের ভিত্তিতে পরবর্তী সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক সংস্কার ও পুর্নগঠনের ভিত্তিতে থানা গুলোকে উপজেলা উন্নীত করা হয় বিধায় তখন এর নাম পরিবর্তন করে উপজেলা সমাজসেবা রাখা হয়। এ কার্যক্রমের নাম প্রশাসনিক রদবদলের কারণে কখনো উপজেলা সমাজসেবা আবার কখনো গ্রামীণ সমাজসেবা হয়ে থাকে।

৪.২ গ্রামীণ সমাজসেবার সংজ্ঞা

গ্রামীণ সমাজসেবা হল বহুমুখী ও সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ভূমিহীন ও অসুবিধা গ্রস্তদের সংগঠিত করে, তাদের প্রতিভা বিকাশের নেতৃত্বদান এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন করার প্রচেষ্টা চালানো যায়। যাতে সীমিত সম্পদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের সমস্যা সমাধানের ভিত্তিতে গ্রামীণ পশ্চাৎ পদ জনগণের সুষম উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের সাথে সাথে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটে। বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রামীণ সমাজ সেবার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে "গ্রামীণ সমাজসেবা হচ্ছে বহুমূখী ও সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভূমিহীন ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠির সংগঠন প্রতিভা, নেতৃত্ব প্রদান এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ক্ষমতার বিকাশ সাধনের প্রচেষ্ঠা চালানো হয়। যাতে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সব শ্রেণীর গ্রামীণ জনগণের সুষম উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের সঙ্গে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটে"।

গ্রামীণ সমাজসেবার লক্ষ্য (Aims of Rural Social Services)

গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে তাদের আয় দক্ষতা বৃদ্ধি করে, তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান ও জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করাই এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। বিশেষ কতগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গ্রামীণ কমাজসেবা এর যাত্রা শুরু হয়। তা হলো-

বিশেষ কতগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জ.ঝ.ঝ এর যাত্রা শুরু হয়। যথা ঃ

১। সরকার ও জনসাধারণের যৌথ প্রচেষ্টায় Target Group এ উন্নয়ন ও পুর্ণবাসনের মাধ্যমে সুষম ও সুশৃংখল গ্রামীণ সমাজ গড়ে তোলা।

২। গ্রাম হতে শহরে স্থানান্তরিতদের সংগঠিত করে স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যম আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা।

৩। গ্রামীণ সংগঠন তৈরি করা ও জনগণের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশ করা।

৪। ঞধৎমবঃ এৎড়ঁঢ় কে কর্মক্ষম করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রকারে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং অকৃষিভিত্তিক আয় বৃদ্ধি করা।

৫। জন্মহার রোধ করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা চালু করা ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধকরা।

৬। আত্মকর্মসংস্থানের জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পূর্নবাসনের ব্যবস্থা রাখা, শারিরীক প্রতিবন্ধী ও অক্ষমদের জন্য কল্যাণমূলক ও পূর্ণবাসনমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা।

৭। কুটির শিল্পের প্রসার ঘটানো এবং ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে বেকারত্ব হ্রাস ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

৮। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং নির্ভরশীল মানসিকতা পরিবর্তন স্বনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এবং আধুনিক জ্ঞান ও ধ্যান ধারণা গ্রহনে জনগণকে উৎসাহিত করা।

৯। গ্রামীণ জনগণের বিভিন্ন প্রকার চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১০। গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন ।

১১। সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

১২। পল্লীর ভবঘুরে ও উশৃংখল যুবকদের নতুন প্রেরণা ও শিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে সুশৃংখল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তর পল্লী সমাজসেবা প্রকল্পের নিচের পাঁচটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে -

১) দেশের গ্রামীণ এলাকায় বসবাসরত বিশেষ করে অনগ্রসর ভূমিহীন, বিত্তহীন কৃষক, বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু-কিশোর, বেকার বয়স্ক পুরুষ ও দরিদ্র মহিলাদেরকে সংগঠিত করে কারিগরি ও পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে লাভজনক অর্থনৈতিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

২) গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থান উন্নয়ণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে ঘুর্ণায়মান তহবিল প্রদান সঞ্চয় সৃষ্টি ও অর্থকরী লাভজনক কর্মকান্ডের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

৩) গ্রামের দারিদ্রতম জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন, শিশু যত্ন হাতে খাবার স্যালাইন তৈরি জলাবদ্ধ পায়খানার উপকারিতা বিশুদ্ধ পানি পানের উপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া।

৪) পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রনে উদ্বুদ্বকরণ ও সামগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৫) গ্রামের দারিদ্র জনগোষ্ঠির তাদের পরিবার এবং জনগোষ্ঠির মধ্যে সামাজিক চেতনার বিকাশ ও সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা।

৪.২.৩ গ্রামীণ সমাজসেবার বৈশিষ্ট্য

ক) উন্নয়নের একক হিসেবে 'গ্রাম' কে নির্ধারণ করা।

খ) টার্গেট গ্রুপ হিসাবে গ্রামীণ অবহেলিত সুবিধা বঞ্চিত, প্রান্তিক কৃষক ভূমিহীন চাষী, মহিলা শিশু, বৃদ্ধ ও যুবকদের নির্ধারণ করা।

গ) স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের সাথে জনগণের ও সরকারের সহযোগিতার সমন্বয় সাধন।

ঘ) তৃণমূল পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রনয়ণের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও জনগণের অংশগ্রহন প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে।

ঙ) বহুমূখী ও সমন্বিত গ্রাম ভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া হচ্ছে এ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য।

চ) গ্রামীণ জনগণকে সংগঠিত করে তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা বোধ সৃষ্টি করা।

গ্রামীণ সমাজসেবার গুরত্ব

গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনসেবার গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো -

১) **আয় ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে** ঃ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ গ্রহন করে, ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে নিজেদের সংগঠিত করে কর্মের ব্যবস্থা করতে পারে। বিশেষ করে মহিলা জনগোষ্ঠিকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারিবারিক জীবনমান উন্নয়নে এবং আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম।

২) **সঞ্চয় ও মূলধন গঠন** ঃ সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যে বাধ্যতামূলক সাপ্তাহিক সঞ্চয় করতে হয় ঞধৎমবঃ এৎড়ঁঢ় কে এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির কিছুটা মূলধন গড়ে উঠে এবং তা ভবিষ্যতে আবার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারে। এভাবে সদস্যদের মধ্যে নিজেদের সঞ্চয়ি মনোভাব গড়ে তোলার মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টির ক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজসেবা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩) **শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টি ক্ষেত্রে** ঃ গ্রামীণ অশিক্ষিত ও নিরক্ষর জনগণের মধ্যে অক্ষর জ্ঞান প্রদান এবং দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই কর্মসূচির গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪) **প্রাথমিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে** ঃ পল্লীর স্বাস্থ্যহীনতা প্রতিরোধ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূরীকরণ ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনগণকে শিক্ষা প্রদাণের জন্যে পরিষ্কার-পরিছন্নতা অভিযান ধাত্রী প্রশিক্ষণ টিকা প্রদান ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজসেবা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৫) **শিশু যুবক ও মহিলা উন্নয়নের ক্ষেত্রে** ঃ গ্রামীণ যুবক, মহিলা, শিশুদের সংগঠিত করে তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে দায়িত্বশীল ও আত্মনির্ভরশীল নাগরিক সৃষ্টির করার ক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজসেবা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪.২.৪ গ্রামীন সমাজসেবার কর্মসূচীসমূহ

গ্রামীণ জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জীবন মান উন্নত করার জন্য গ্রামীণ সমাজসেবা নিম্ন লিখিত কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। যথা–

১) দারিদ্র দূরীকরণ ও আত্মনির্ভরশীলতা: গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি চালূ হয় গ্রামীণ জনগোষ্ঠোর দারিদ্র দূর করে আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলার জন্য। এই জন্য গ্রামীণ সমাজসেবা ক্ষুত্র ব্যবসার মাধ্যমে আত্মনির্ভরলীতা অর্জনের জন্য সুদবিহীন ঋণ প্রদান করে। বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধমে লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠিকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে।তাদের ঋণ আদায়ের পরিমান ৯০% । জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করার জন্য হাঁস-মুরগীর খামার শাকসব্জির চাষ, কৃষি শিক্ষা সমবায় সমিতি মজাপুকুর সংস্কার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

২) স্বাস্থ্য কর্মসূচি: গ্রামীণ জনগনের সু স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্যে জ.ঝ.ঝ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করেছে। যেমন- টিকা প্রদান, খাবার সেলাইন তৈরি, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান দান ইত্যাদি।

৩) শিক্ষা কর্মসূচি: জ.ঝ.ঝ বিশ্বাস করে অশিক্ষা দূর করতে পারলে গ্রামীণ জনগণের উন্নতি সাধিত হবে। এ জন্য জ.ঝ.ঝ এর লক্ষ্য দলের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। জ.ঝ.ঝ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা চালু করে বয়স্ক ও ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিচ্ছে। এ পর্যন্ত জ.ঝ.ঝ ২৮.২৩% শিশুকে স্কুলগামী করতে সক্ষম হচ্ছে।

৪) কারিগরি প্রশিক্ষণ: এ প্রকল্পের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা রয়েছে। সেলাই ও দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারি, বাঁশ-বেত, বৈদ্যুতিক কার্যক্রম, পাটের কাজ, কাঠের কাজ,তাঁত ও বয়ন কাজ, হাঁসমুরগী পালন গরু মোটাজাতকরণ, কামার-কুমারের কার্যক্রম শাকসব্জি চাষ, টাইপের কাজ ইলেক্টিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স কাজ, টিভি, রেডিও এবং ঘড়ি মেরামত, বাইসাইকেল, কম্পিউটার শিক্ষা পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয় হয়ে থাকে।

৫) মাতৃ কেন্দ্র: পল্লী মাতৃ কেন্দ্রের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত মাতৃ কেন্দ্রের দুটি বিশেষ কর্মসূচি হলো-

(ক) প্রশিক্ষণ-কাম-উৎপাদন কেন্দ্র যার মাধ্যমে স্থানীয় কাঁচামাল ও উৎপাদনের চাহিদা ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

(খ) মহিলা ঋণদান কর্মসূচি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের পুঁজি সমস্যা সমাধানের জন্য কিছূ নীতি মালার অধীনে ঋণ দেয়া হয়।

৬) **পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা কার্যক্রম** ঃ গ্রামীণ অঞ্চলে বিভিন্ন সমস্যার মূলে রয়েছে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। গ্রামীণ সমাজসেবা মাঠ কর্মীদের সাহায্যে এবং বিভিন্ন প্রচারণা চালিয়ে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণ বিশেষ করে

মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করে তোলে। সক্ষম দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতির ব্যবহার ও জন্ম শাসন নিয়ন্ত্রণ রাখার উপদেশ দেয়া হয়।

৭) **শিশু কেন্দ্র স্থাপন ঃ** প্রতিটি উপজেলায় ৮টি করে শিশু কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা রয়েছে। শিশু কেন্দ্র গুলোতে শিশুদের চরিত্রবান স্বাস্থ্যবান, দায়িত্বশীল ও সুশৃংখল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা রয়েছে। উক্ত কেন্দ্রে তাদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক উন্নয়ন ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

৮) **যুব কল্যাণ ঃ** এ ক্ষেত্রে জ.ঝ.ঝ যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে বেকার যুবকদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। স্কুল বহিভূত যুবক ভবঘুরে তরুণ ও বেকারদের সংঘঠিত করে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে থাকে। তাছাড়া তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য চিত্তবিনোদন কর্মশিবির ইত্যাদির কাজে অংশগ্রহনে সহায়তা করে থাকে।

৯) **অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঃ** জ.ঝ.ঝ এর আওতায় গ্রামীণ অবকাঠামোর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। কাঁচা পাঁকা রাস্তা তৈরি , সাঁকো তৈরি ইত্যাদি জ.ঝ.ঝ করে থাকে।শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৬টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়। গ্রামীণ সমস্যা সম্পদ এবং সমাধান সম্পর্কে গ্রামবাসীদের সচেতন করে তোলা এর মূল লক্ষ্য।

১০) **প্রতিবন্ধীদের জন্য কার্যক্রম ঃ** জ.ঝ.ঝ বিকলাঙ্গ, পঙ্গু , বধির, অন্ধ, অক্ষম প্রভৃতি প্রতিবন্ধীদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের পর্নুবাসন করে থাকে।এই জন্য বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম জ.ঝ.ঝ অধীনে প্রচলিত আছে।

সার সংক্ষেপ

এই পাঠশেষে আপনি বাংলাদেশে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকাররে গৃহীত অন্যতম কর্মসূচি গ্রামীণ সমাজসেবা সম্পর্কে জানতে পারবেন। এটি একটি গ্রামীণ উন্নয়নের বহুমূখী প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির দারিদ্র দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ঋণ প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রদান, মাতৃমঙ্গল ব্যবস্থা কেন্দ্র স্থাপন, পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা কার্যক্রম গ্রহনসহ গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সংঘঠিত করে তাদের মধ্যে নেতৃত্ব বিকাশ সাধনের মাধ্যমে এই কর্মসুচি কাজ করে যাচ্ছে।

অনুশীলনী

নৈব্যক্তিক প্রশ্ন

১) কত সালে গ্রামীণ কর্মসূচি চালু হয়?

ক) ১৯৭৪ সালে খ) ১৯৮৪ সালে
গ) ১৯৮৮ সালে ঘ) ২০০৪ সালে
উত্তরঃ ক

২) গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি হচ্ছে-

ক) একমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া খ) দ্বিমূখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া
গ) ত্রিমূখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া ঘ) বহুমূখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া
উত্তরঃ ঘ

৩) গ্রামীণ সমাজসেবার অন্যতম লক্ষভূক্ত জনগোষ্ঠী হচ্ছে-

ক) প্রান্তিক কৃষক খ)মহিলা
গ) শিশু ও যুবক ঘ) উভয় সকল দল
উত্তর : ঘ

৪) গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচিটি

ক) সরকারি খ) বেসরকারি
গ) সায়ত্ত্বশাসিত ঘ) স্থানীয় সেচ্ছসেবী প্রতিষ্ঠান
উত্তরঃ ক

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

১) বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজসেবার সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্যগুলির বিবরণ দিন।

২) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজসেবার ভূমিকা কর্মসূচি আলোচনা করুন

৩) গ্রামীণ সমাজসেবার বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ৪ ঃ শহর সমাজসেবা কার্যক্রম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের পঠভূমি;
- ☞ শহর সমাজসেবা কার্যক্রম কি? এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ;
- ☞ শহর সমাজসেবা কার্যক্রের কার্যসূচিসমূহ;
- ☞ শহর সমাজসেবা কর্মকর্তার ভূমিকা ও কার্যাবলী;
- ☞ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের সমস্যাবলী।

৪.৩.১ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের পটভূমি

সরকারি পর্যায়ে গৃহীত জাতিসংঘের পরামর্শ ও সহায়তায় গৃহীত প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে-শহর সমাজসেবা কার্যক্রম। ১৯৪৭ সালে ভারত থেকে পাকিস্তান বিভক্তির পর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার দেশের আর্থ-সামজিক সমস্যাবলী সমাধানের জন্যে জাতিসংঘের সাহায্য সহযোগিতা কামনা করে। ১৯৫৩ সালে জাতিসংঘের বিশেজ্ঞ দলের মতামতের ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালে "ঢাকা প্রজেক্ট" নামে সমাজকল্যাণের সমষ্টি উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গৃতীত হয়। এর সফলতার ভিত্তিতে ১৯৫৫-৫৬ অর্থ বছরে ঢাকার "কায়েতটুলিতে" শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প কর্মসূচি চালূ হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে ঢাকার গোপীবাগ, লালবাগ ও মোহাম্মদপুরে আরো ৩টি প্রকল্প গ্রহন করা হয়। এসব প্রকল্পের সাফল্যের প্রেক্ষিতে ১৯৫৯-৬০ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হবার পর এর বিস্তৃতি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯৮০ সালে সর্বোচ্চ ৬৮টি প্রকল্প চালূ হয় এবং ১৯৮২ সালের জুলাই পর্যন্ত প্রতিটি পৌর এলাকায় এ প্রকল্প চালু করা হয়। ১৯৮২ সালের ১২ জুলাই তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের নির্দেশে চাকুরী পুর্নবিন্যাসের লক্ষ্যে গঠিত এ নাম কমিটির সুপারিশ ও মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা ৮০টি হতে কমিয়ে ৩৯টি করা হয়। পরবর্তীতে এর সংখ্যা দাড়ায় ৪৩টি।

১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক পুর্নগঠনের ফলে সমাজকল্যাণ বিভাগের নাম পরিবর্তন করে সমাজসেবা অধিদপ্তর রাখা হয়। শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পেরা নাম পৌর সমাজসেবা প্রকল্প রাখা হয় । বর্তমানে এটি শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প নামে পরিচিত । শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম দেশের ২৮টি জেলায় বিস্তৃত। অবশিষ্ট ৩৬টি জেলা শহরে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৪.৩.২ শহর সমাজসেবা কার্যক্রম কি? এর উদ্দেশ্যসমূহ ও লক্ষ্যগুলো কি?

শহর সমাজসেবা শহর এলাকায় পরিচালিত একটি সমষ্টি উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ। সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে শহররে জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো হয়। জনগণের সূখী ও সুন্দর জীবন গঠনের লক্ষ্যে এখানে পারস্পরিক সম্পর্ক সোহার্দ্য ও সহযোগিতার উপর গুরুত্বরোপ করা হয়।

সুতরাং শহর সমাজসেবা বলতে শহর এলাকার সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন এক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপকে বুঝায়; যেখানে সরকার ও জনগণের যৌথ উদ্যোগে, জনগণের সমস্যা সমাধান, চাহিদাপূরণ এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। সুতরাং শহর সমাজসেবা বলতে শহর এলাকার সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন এক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপকে বুঝায়; যেখানে সরকার ও জনগণের যৌথ উদ্যোগে জনগণের সমস্যা সমাধান, চাহিদাপূরণ এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৪.৩.৩ শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

শহর সমাজ কার্যক্রমের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শহর এলাকায় কার্যকরী সম্প্রদায় গড়ে তোলা, যাতে নিজস্ব এলাকার সংগে জনগেণের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্থানীয় জনগণের যৌথ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় আর্থ-সামজিক সুযোগ সুবিধা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানো শহর সমাজসেবার মূল লক্ষ্য।

সমাজসেবার অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত শহর সমাজসেবার উদ্দেশ্য হলো সুপরিকল্পিতভাবে শহর এলাকায় বসবাসরত জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা এবং আত্ম সহায্যের ভিত্তিতে শহরাঞ্চলের বিভিন্ন আর্থ-সমাজিক সমস্যা সমাধান করে জনগেণের জীবন মান উন্নয়ন। বাংলাদেশে শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমের কতিপয় উদ্দেশ্য নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো–

(১) বস্তিতে বসবাসকারি বসবাসস্থলে পরিবেশ পরিস্কার-পরিছন্ন রাখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ;

(২) কর্মমূখী যুগোপযোগী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

(৩) বস্তিবাসীদের স্বকার্যের মাধ্যমে জীবন মানের উন্নয়নের লক্ষ্যে সুদ মুক্ত পুঁজি সরবরাহ করা;

(৪) বস্তিবাসীর শিশুদের লেখা-পড়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং নিকটবর্তী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রেরণের ব্যবস্থা করা;

(৫) প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং পরিবার পরিকল্পনা গ্রহনে উদ্বুদ্ধকরণ;

(৬) বস্তিবাসীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যার আলোকে চাহিদা নির্ধারণের জন্যে জরীপ কাজ পরিচালনা;

(৭) বস্তি ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দূষণমক্ত রাখার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ;

(৮) সম্ভাব্যক্ষেত্রে শহরমুখী লোকদের গ্রামে তার পৈত্রিক ভিটা মাটিতে পুর্ণবাসনের লক্ষ্যে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে পূর্ণবাসনের ব্যবস্থাকরণ;

(৯) শহরে বসবাসরত মধ্যবিত্ত, উ□চ *মধ্যবিত্ত দরিদ্র পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী সাংস্কৃতিক ও দক্ষতা বৃত্তি*মূলক নানা ধরণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা;

(১০) শহরে অবস্থিত সেবাদানকারী বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকরী সংস্থার সেবা প্রাপ্তিতে শহরবাসীকে সহায়তা করা;

(১১) সরকারী প্রচেষ্টার সাথে বেসরকারী প্রচেষ্টার সমন্বয়ের মাধ্যমে এলাকার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের সহায়তা প্রদান;

(১২) অর্থনৈতিক দিকে গুরুত্বারোপ ও আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ করা। বস্তি বাসীদের ও নিম্ন আয়ভূক্ত পরিবারের জন্যে ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা অর্জনে সহায়তা করা।

৪.৩.৪ শহর সমাজসেবা পরিচালিত কর্মসুচিসমূহ

শহর এলাকার দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর সার্বিক আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও চিত্তবিনোদনমূলক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে শহর সমাজসেবা কাজ করে থাকে। বিশেষ করে জনগণের মৌল মানবিক চাহিদা ও অনুভূতি প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে শহর সমাজসেবা কর্মসুচি গৃহীত হয়। দেশের কম বেশি প্রত্যেকটি শহরে জনগণের বিভিন্ন সমস্যা যেমন: দরিদ্র, বেকারত্ব ,জনসংখ্যা স্ফীতি, অস্বাস্থ্য, অপুষ্টি, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ , ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি মাদকাসক্তি, নৈতিক অধঃপতন, বস্তিসমস্যা ও অস্বাস্থ্যকর আবাসন সমস্যা প্রভৃতি সমস্যা বিদ্যমান। এইসব সমস্যা সমাধান করে সুস্থ সুন্দর নাগরিক জীবন যাত্রা প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্তে শহর সমাজসেবা কতিপয় নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করেছে; তাহলো -

১মত ঃ বেকার যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রম;

২য়ত ঃ মহিলাদের কুঠির শিল্প ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম;

৩য়ত ঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সামাজিক শিক্ষা বিস্তার ও পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম;

৪র্থত ঃ স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম এবং

৫মত ঃ সাংস্কৃতিক ও চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি।

উপরোক্তো নির্দিষ্ট কার্যক্রমের আওতায় শহর সমাজসেবা যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা পর্যায়ক্রমে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১) **কারিগরি প্রশিক্ষণ ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম ঃ** এটি শহর সমাজসেবার প্রধান কর্মসূচি। অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে মহিলা ও পুরুষের জন্য আয় বর্ধন বৃত্তিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম, বেকার ও অর্ধবেকারদের জন্য কর্মসংস্থানও স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। এ জন্য শহর সমাজসেবা-

(ক) পাট বস্ত্র ও বেতের কাজ (খ) সেলাই ও উল বুনন (গ) কার্পেট, মাদুর ও পুতুল তৈরি। (ঘ) বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মেরামতের কাজ (ঙ) মোটর ড্রাইভিং, বাইসাইকেল ও রিক্সা মেরামত (চ) শর্টহ্যান্ড ও টাইপ রাইটিং এবং (ছ) ওয়েল্ডিং ও গ্রীলের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তাছাড়া চাকরি বিনিয়োগ কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করে বেকারদের চাকুরি দানের ব্যবস্থা করে। এই কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ১৩৮ জনকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৫৯, ৪০৮জনকে ঘূর্নায়মান ফান্ডের আওতায় স্বকর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয়েছে।

২) **নিরক্ষরতা দূরীকরণে কার্যক্রম ঃ** শিক্ষামূলক কর্মসূচি শহর সমাজসেবার অন্যতম গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শহর সমাজসেবা প্রকল্প এলাকায় অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার মানসে এই কার্যক্রমের আওতায় যে সব

শিক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে; তা হলো- (ক) বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র (খ) প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা (গ) নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা (ঘ) সাধারণ পাঠাগার স্থাপন (ঙ) ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং (চ) সামাজিক শিক্ষা ইত্যাদি

৩) **পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ** শহরাঞ্চলে বিশেষ করে বস্তি এলাকায় পরিস্কার-পরিছন্নতা ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা এবং তাদের সহায়তায় এগুলোর ব্যবস্থা করা হয়। শহর সমাজসেবা পরিবেশ উন্নয়নের জন্য যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে; তা হলো- (ক) সেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে রাস্তা-ঘাট তৈরি মেরামত ও রক্ষণ (খ) পরিস্কার-পরিছন্নতা অভিযান (গ) ভিক্ষুক পুর্নবাসন এবং (ঘ) যান-জট নিরসন ও খাল খনন কর্মসূচিই প্রভৃতি।

৪) **স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম ঃ** এই কার্যক্রমের আওতায় যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে; তা হলো- (ক) দাতব্য চিকিৎসালয় ও ক্লিনিক স্থাপন (খ) রোগ প্রতিরোধমূলক টিকা ও ইনজেক্শন প্রদান (গ) পরিবার পরিকল্পনা (ঘ) মাতৃমংগল ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন (ঙ) মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম (চ) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা প্রদান (ছ) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশনের ব্যবস্থা (জ) সংক্রামক ব্যাধি ও মহামারি প্রতিরোধ এবং (ঝ) স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শদান ও উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি।

৫) **চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রম ঃ** এই কার্যক্রমের আওতায় যে সব বিষয় রয়েছে; তা হলো- (ক) খেলার মাঠ ও শিশু পার্ক স্থাপন (খ) ক্লাব ও পাঠাগার স্থাপন (গ) খেলা-ধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন (ঘ) প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন এবং (ঙ) জাতীয় ভিত্তিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রভৃতি।

উপরোক্ত কার্যক্রমগুলো ছাড়া শহর সমাজসেবা আরো যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করেছ; তা হলো-

(১) পথশিশু কেন্দ্র স্থাপন;
(২) আশ্রয়হীন মেয়েদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থাকরণ;
(৩) পথশিশুদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;
(৪) বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রা;
(৫) শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন;
(৬) যুব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম;
(৭) নারী ও শিশুকল্যাণ কার্যক্রম প্রভৃতি।

উপরোক্ত কার্মসূচি গুলো বাস্তবায়ন করার জন্য শহর সমাজসেবা নিজস্ব প্রকল্পের অধীনে কর্মরত সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গুলোকে সর্ব প্রকার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। এই উদ্দেশ্যে প্রকল্প পরিষদ গঠন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিষদ যাবতীয় কর্মসূচি পরিচালনা ও তথা বিভিন্ন ধরণের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

৪.৩.৫ শহর সমাজসেবা কর্মসূচির সমস্যা ঃ শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলশ্রুতিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অর্থনৈতিক মন্দা ইত্যাদি কারণে আমাদের দেশের শহরগুলোতে জনসংখ্যার চাপ প্রতিনিয়ত বেড়ে চলছে। সীমিত সম্পদে বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা ও সমস্যা মেটানোর ক্ষেত্রে শহর সমাজসেবার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সৃষ্টিলগ্ন থেকে অদ্যাবধি এই কর্মসুচির অবদান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রশংসিত। তবে শহরের পরিধি ও সমস্যার ব্যাপকতা যে হারে বেড়েছে কর্মসূচীর প্রসার কিংবা জনসাধারণের উৎসাহ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে অনুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। বর্তমানে শহর সমাজসেবা কর্মসূচির যে সব সমস্যার সম্মূখীন হচ্ছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:-

(১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কর্মসুচি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় জনগণ সক্রিয়ভাবে এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে না। এই কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচতনতা সৃষ্টি করারও তেমন কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহন করেনি।

(২) শহর সমাজসেবার উদ্দেশ্য কর্মসূচি ও লোকসংখ্যা অনুযায়ী কর্মসূচির ব্যাপকতা অনুযায়ী বাস্তবায়নের জন্যে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সেই তুলনায় অত্যন্ত সীমিত অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। অর্থের অভাব এই কর্মসূচি বাস্ত বায়নের মূল সমস্যা।

(৩) শহর সমাজসেবা কর্মসূচির অন্যতম সমস্যা হচ্ছে- শহর এলাকার জনগণের অনুভূত চাহিদা ও মৌল মানবিক চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্বহীনতা। গতানুগতিক কর্মসূচি পরিচালনার কারণে জনগণের মধ্যেও এই কর্মসূচি সাড়া জাগাতে পারেনি এবং জনগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না।

(৪) **সমন্বয়ের অভাব ঃ** প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থা এবং জাতি গঠনমূলক বিভাগ সমূহের সংগে শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু সমন্বয় ও কার্যকর যোগাযোগের জন্য কোনরূপ সমন্বয় সাধনকারি ব্যবস্থা নেই।

(৫) আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ঃ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা। কর্মচারীদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি আমলাতান্ত্রিক। তাদের সেবাদানের মানসিকতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

(৬) পেশাদার সমাজকর্মীর অভাব ঃ শহর সমাজসেবা কর্মসূচি সমাজ কর্মের অন্যতম দিক সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠনের আলোকে প্রণীত হয়েছে। কিন্তু এই কর্মসূচিতে পেশাদার সমাজকর্মীর পরিবর্তে অন্যান্য সমাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের লোক কর্মকর্তা হিসেবে কাজ নিয়োজিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

(৭) প্রশিক্ষণের অভাব ঃ এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যে যে সব কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছেন তাদেরকে সমষ্টি উন্নয়ন সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়ার তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। ফলশ্রুতিতে কর্মকর্তাদের/কর্মচারীদের কাছ থেকে সন্তোষজনক কাজের মান পাওয়া যাচ্ছে না।

(৮) মূল্যায়নের অভাব ঃ জনগণের চাহিদা ও প্রয়োজনের সাথে সংগতি রাখার জন্যে এই কর্মসূচির ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়নের যে, প্রয়োজন রয়েছে তা কর্মসূচির শুরু লগ্ন থেকে আজও করা হয়নি।

(৯) ত্র□টিপূর্ণ প্রকল্প পরিষদ ও কর্মীদের পদোন্নতি ও সুযোগ-সুবিধার অভাব ঃ গতানুগতিক প্রথায় এবং ধরাবাঁধা দুটি প্রকল্প পরিষদ গঠন করা হয়েছে তাতে অর্থবহ কোন সমন্বয় সাধন করতে পারেনি। তাছাড়া, এই প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মীদের তেমন কোন পদোন্নতির সুযোগ না থাকায় তাদের মধ্যে কোন কর্ম স্পৃহা নেই এবং তারা গতানুগতিক ও দায়সারাভাবে কোন রকমে কাজ করে যাচ্ছে।

উপরোক্ত সমস্যাগুলো যদি সমাধান করার উদ্যোগ গ্রহন করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে এই কর্মসূচি শহর উন্নয়নে আরো কার্যকরি ভূমিকা পালন করতে পারবে।

অনুশীলনী

রচনাবলী প্রশ্ন

১। শহরসমাজসেবা কার্যক্রম কি? এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা কর।
২। বাংলাদেশে শহরসমাজসেবা কর্মসূচীর বিবরন দাও।
৩। বাংলাদেশের শহরসমাজসেবা কর্মসূচীর সীমাবদ্ধতাগুলো আলোচনা কর।
৪। বাংলাদেশে শহরসমাজসেবা কর্মসূচীর লক্ষ্য ও কার্যক্রমগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।

পাঠ ৪ ঃ শিশুকল্যাণ কর্মসূচি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ শিশু কারা? শিশুকল্যাণ বলতে কি বোঝায়
- ☞ শিশুকল্যাণের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যসমূহ
- ☞ শিশুদের মৌল মানবিক চাহিদা
- ☞ বাংলাদেশে শিশুকল্যাণের জন্যে সরকারি কর্মসূচি
- ☞ কর্মসূচির সমস্যাসমূহ

৪.১ শিশু কারা (Who are the Child)?

শিশু কল্যাণ ধারণা ব্যাখ্যা করার আগে সর্ব প্রথম যে প্রত্যয়টি বিবেচনায় চলে আসে তাহলো- শিশু কারা? এ বিষয়ে এখন ও পর্যন্ত কোন সার্বজনীন উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে তাদের প্রচলিত রীতি-নীতি অনুযায়ী শিশুকে বয়স কাঠামোর মধ্যে রেখে সংজ্ঞায়িত করেছে। জাতিসংঘ (UN) শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী The child accepted below sixteen (16) years old (১৬ বছরের নীচে বয়সী সকল বালক-বালিকা শিশু হিসেবে গন্য) বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪'র অনুযায়ী "শিশু বলতে অনুর্ধ্ব ষোল (১৬ বৎসর) বয়সকে বোঝানো হয়েছে।"

বাংলাদেশ শিশু নীতি ১৯৯৪ অনুযায়ী "বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় প্রেক্ষাপটে চৌদ্দ বছর (১৪) পূর্ণ হয়নি এমন সব ছেলে-মেয়েদের শিশু হিসেবে গণ্য করা হবে।"

উপরোক্ত বিভিন্ন আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কোন দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী স্বীকৃত তথা নির্ধারিত বয়সক্রম পর্যন্ত বিদ্যমান সবাই শিশু।

শিশু কল্যাণ বলতে কি বুঝায়?

সহজ কথায় শিশুদের জন্য গৃহীত প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কল্যাণমূলক প্রচেষ্টার সমষ্টিই হলো শিশু কল্যাণ; যা শিশুর জন্মের পূর্ব হতে শুরু হয় এবং যা পিতা-মাতা ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদান করা হয়। **ভারতীয় সমাজকর্ম বিশ্বকোষ**, ১৯৬৮ ভলিয়ম-১৮ শিশু কল্যাণ হচ্ছে- "শিশুদের সামগ্রিক মঙ্গল সাধনে গৃহীত সকল সেবাসমূহ যা কিনা শিশুদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় এবং সামাজিক বিকাশে পরিপূর্ণ উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে। W. A Friedlander and R.Z. Apte (1974)--"সমস্যা গ্রস্থ শিশুদের যত্নসহ সকল সামগ্রিক মঙ্গল নিশ্চিতকরণের জন্য সরকারি-বেসরকারি সকল সেবাসমূলক তৎপরতাকে শিশুকল্যাণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। "হ্যাজেল ফ্লেদারিকেন (Hezel Fredericken) এর মতে "শিশুকল্যাণ বলতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গৃহীত সে সব সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং দৈহিক কার্যক্রমকে বুঝায়; যে গুলো সকল শিশুর দৈহিক বুদ্ধিবৃত্তিক, মানবিক, আবেগীয় উন্নতি ও সার্বিক কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত।"

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, পর্যায়ে গৃহীত সেসব কার্যাবলীর সমষ্টিকে বুঝায় যেগুলো শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সমাজিক সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও সার্বিক কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত। শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনে সহায়তা করা শিশু কল্যাণের মূল লক্ষ্য।

৪.২ শিশুকল্যাণের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য

শিশুকল্যাণের উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ:

- ➢ সুস্থ সবল শিশুর জন্মদান, সঠিক লালন-পালন ও বিকাশ সাধন;
- ➢ শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বুদ্ধিবৃত্তীয় ও আবেগীয় বিকাশ সাধনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা;
- ➢ মা ও শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ সাধন করা;
- ➢ অর্থনৈতিক চাহিদাসহ মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করা;
- ➢ শিশুদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করে দায়িত্বশীল, সৃজনশীল ও আত্মনির্ভরশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা;
- ➢ শিশুদের সুশিক্ষিত ও কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা;

- শিশুদের চরিত্র গঠনে নির্মল চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা;
- শিশুদের সকল প্রকার নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা প্রভৃতি;
- দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক পঙ্গু শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে সম্পদশালী সদস্য হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করা;
- সকল প্রতিকুল অবস্থা থেকে শিশুদের সামগ্রিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

শিশু কল্যাণের বৈশিষ্ট্য

মনীষী R.A. Skidmore এবং M. G. Thackeroy শিশু কল্যাণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন তাদের মতে শিশু কল্যাণের বৈশিষ্ট্য হলো (১) সেবা প্রদাণের একটি ক্ষেত্র (A field of service) (২) সমাজকর্ম অনুশীলনের একটি ক্ষেত্র; যা বিভিন্ন মূখী শিশুকল্যাণ কার্যক্রম নিয়ে গঠিত (A social work practice are that encompasses a variety of child Welfare activities) (৩) শিশুকল্যাণ অনুশীলনের এমন একটি ক্ষেত্র; যা শিশু কল্যাণের সংগে সংশ্লিষ্ট নীতি, সমস্যা ইস্যুর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয় (A practice field that focuses attentions or issues problems and policies related to the welfare of children) (৪) শিশু সমস্যা সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতার অনুশীলন (৫) শিশুদের সামাজিক ভূমিকা শক্তিশালীকরণ (The enhancement of social functioning of children)

শিশুদের চাহিদা ও সেবা যত্ন অন্যান্যদের চেয়ে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশই শিশু কল্যাণের দার্শনিক ভিত্তি। এর যে সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা নিম্নরূপ:

১মত ঃ শিশুকল্যাণ শিশুর জন্মে পূর্ব থেকেই শুরু হয় এবং কিশোর পর্যন্ত শিশুর সার্বিক কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত।

২য়ত ঃ এটি পিতা-মাতা ব্যতীত অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদান করা হয় ।

৩য়ত ঃ এটি জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শিশুর কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত।

৪র্থত এটি শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগীয় প্রভৃতি দিকের সুষ্ঠ সমন্বিত বিকাশ সাধনে নিয়োজিত।

৫মত ঃ এটি মাতৃমঙ্গল থেকে শুরু করে পরিবারস্থ অন্যান্য সকল সমস্যাকে অন্তর্ভূক্ত করে।

৬ষ্ঠত ঃ এটি শিশুর মৌল-মানবিক ও উন্নয়নমূলক দিকের উপর গুরুত্ব প্রদান করে।

৭মত ঃ এটি শিশুর সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন সৃজনশীল, স্বনির্ভরশীল ও দায়িত্বশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস চালায়।

৮মত ঃ এটি শিশুর সুষ্ঠ ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরণের নিরাপত্তা প্রদান করে; চরিত্র গঠনের সহায়তা করে এবং নির্মল চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করে এবং

৯মত ঃ এটি শিশুদের অবহেলা, নির্যাতন, প্রবঞ্চণা ও অপব্যবহারের হাত থেকে রক্ষা করা।

৪.৩ শিশুর মৌল মানবিক চাহিদা (Basic Human Needs of Children)

সহজকথায় চাহিদা হলো কোন কিছুর প্রয়োজন বা অভাববোধ। যা যথাযথভাবে পূরিত না হলে শিশুর মধ্যে এক প্রকারের অস্বস্তি বা চাপের সৃষ্টি হয় এবং উদ্দেশ্য সাধনের দিকে বাধিত হয়। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ, মনোজীবনের লালন ও পীড়ন এবং ক্রমপর্যায়িক সুষ্ঠ বৃদ্ধির জন্য কতগুলো স্বাভাবিক চাহিদা প্রয়োজন। শিশুর এই সব চাহিদার পূরণ তার জীবন বিকাশের স্বাচ্ছন্দ ধারাটিতে যে স্বাস্থ্যময় স্ফুর্তির ও শক্তির (energitic) সঞ্চার করে তাতেই শিশুর জীবনে সংগতি বিধানের কাজটি সুস্থ, সুন্দর ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর চাহিদাগুলোর সম্পূর্ণ না হলে শিশুর জীবনে নানা প্রকার অসংগতি দেখা দেয় এবং তার বিকাশ বাধাঁ প্রাপ্ত হয়। একটি শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য তার বিভিন্ন চাহিদা প্রয়োজন। তার এই চাহিদা গুলোকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। ভারতীয় মনোবিজ্ঞানী সেনগুপ্ত ঘোষ এবং রায় (Shengupta, Gosh and Roy) ১৯৮৩ তাদের ''Educational Psychology'' তে শিশুদের চাহিদাকে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন-

(১) শারীরিক চাহিদা (Physical Needs)
(২) মানসিক চাহিদা (Psychological Needs)
(৩) পরিবেশগত (Environmental Needs)

আবার ভারতীয় মনোবিজ্ঞানী **ডঃ জগেন্দ মন্ডল** (Jagadindra Mandal) শিশুর চাহিদাসমূহকে চারভাগের ভাগ করেছেন। যথা:

১মতঃ শারীরিক চাহিদা (Physical Needs)

ক) খাদ্যের চাহিদা
খ) বাসস্থানের চাহিদা
গ) নিদ্রার চাহিদা
ঘ) বিশ্রামের চাহিদা
ঙ) পর্যাপ্ত আলো ও নির্মলবাতসের চাহিদা
চ) উপযুক্ত বস্ত্রের চাহিদা
ছ) প্রতিকুল অবস্থা থেকে মুক্তির চাহিদা
জ) উপযুক্ত তাপমাত্রার চাহিদা

২য়তঃ মানসিক চাহিদা (Psychological Needs)

ক) আত্মস্বীকৃতির চাহিদা
খ) অন্যের সাথে মেলা-মেশার চাহিদা
গ) আত্মবিশ্বাসের চাহিদা
ঘ) নিরাপত্তার চাহিদা
ঙ) ভালোবাসার চাহিদা
চ) স্বাধীনতার চাহিদা

৩য়তঃ সামাজিক চাহিদা (Social Needs)

ক) বন্ধুত্বের চাহিদা
খ) প্রশংসার চাহিদা
গ) শ্রদ্ধার চাহিদা
ঘ) নেতৃত্বের চাহিদা এবং
ঙ) বিশ্বস্ততা অর্জনের চাহিদা

৪র্থতঃ বুদ্ধিবৃত্তীয় চাহিদা (Intelluctual Needs)

ক) নতুন কিছূ জানার চাহিদা
খ) বুঝার চাহিদা
গ) ন্যায়বিচার পারার চাহিদা
ঘ) বিবেকবান হওয়ার চাহিদা

মনোবিজ্ঞানী **মঞ্জুশ্রী চৌধুরী** তাঁর "শিক্ষায় মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান" বইতে শিশুর চাহিদাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন- যথা:

১মতঃ জৈবিক চাহিদা (Biological Needs)

ক) অক্সিজেন
খ) বিশেষ তাপমাত্রা
গ) অবস্থানগত পরিবেশ
ঘ) খাদ্য এবং পানীয় জল
ঙ) বাসস্থান এবং
চ) লালন-পালন

২য়তঃ মানসিক চাহিদা (Psychological Needs)

ক) ভালোবাসা
খ) দৈহিক নিরাপত্তা
গ) আত্মস্বীকৃতি
ঘ) নতুনত্ব
ঙ) স্বয়ংক্রিয়তা
চ) স্বাধীনতা
ছ) স্বাভাবিকতা
জ) সামাজিক নিরাপত্তা এবং
ঞ) মৌনাকাংখা

সমাজ বিজ্ঞানী **এ. এইচ. বোলি** (A. H. Booley) তাঁর The problems of family life) গ্রন্থে শিশুর মনস্থাত্বিক চাহিদার একটি বয়স কাঠামো ভিত্তিক উপস্থাপন প্রদান করেছেন। যথা:

১মতঃ শৈশবকালীন (In boyhood (0-2 years) (০-২ বৎসর)

ক) পারিপার্শ্বিকতার স্থায়ীত্বতা
খ) পর্যাপ্ত নিদ্রার জন্য শান্তি এবং নীরবতা
গ) ধীরস্থির কিন্তু রীতিমতো খাবার
ঘ) মায়ের এবং তার বিকল্পের সান্নিধ্য এবং কিছুটা বাবার সান্নিধ্য
ঙ) প্রথম বর্ষশেষে উদ্দীপনা বৃদ্ধি এবং
চ) বিকল্প এবং পর্যাপ্ত খেলা-ধুলার সামগ্রী ।

২য়তঃ বিদ্যালয়ের যাওয়ার পূর্বে ২--৫ বৎসর (In the pre School period (2-5 years)

ক) পিতা-মাতার সান্নিধ্য
খ) আবিস্কারের সুযোগ-সুবিধা
গ) পর্যাপ্ত এবং খেলা-ধুলার সামগ্রী
ঘ) সমসাময়িক বন্ধুত্ব
ঙ) পরিবেশের স্থায়িত্ব

৩য়তঃ ৫-৮ বৎসর বয়সে প্রথম স্কুলে সময়কালীন (In the early school period 5—7 years)

ক) পিতা-মাতা ও অন্যান্য বয়স্কদের সাথে সান্নিধ্য
খ) সমসাময়িক বন্ধুত্ব
গ) বিদ্যালয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সুযোগ প্রসার
ঘ) পরিবেশের প্রসার যেমন-খেলার মাঠ আনন্দ লাভের জন্য বর্হিগমন
ঙ) দুঃসাহসিকতা এবং নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি এবং
চ) স্বাধীনতা ও শৃংখলার মধ্যে ভারসাম্য

৪র্থতঃ ৮-১১ বৎসর বয়সে স্কুলে সময়কালীন (In the later school perioc 8—11 years)

ক) স্বাধীনতা বৃদ্ধি
খ) খেলা-ধুলার সুযোগ
গ) নিয়ম-শৃংখলা
ঘ) ভালো খেলা-ধুলার বন্ধু এবং
ঙ) কাজের প্রতি কঠিন একাগ্রতা

৫মতঃ কিশোরকালীন (১১--১৯ বৎসর) (In adolesence 11—19 years)

ক) পিতা-মাতা থেকে কিছুটা স্বাধীনতা
খ) অন্যান্য বয়স্ক সাথে সান্নিধ্য
গ) ভালো খেলা-ধূলা কর্মকান্ড
ঘ) সৃষ্টিশীল এবং গঠনমূলক কাজের সুযোগ
ঙ) উত্তম বুদ্ধিবুত্তিক উদ্দীপনা
চ) ক্লাবে সামাজিক অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি
ছ) বিপরীত লিংগের প্রতি আকর্ষণ এবং
জ) দায়বদ্ধতা আত্মশৃংখলার মূল্যের স্বীকৃতি

বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও শিক্ষাবিদ প্রফেসর আলী আকবর (Prof. Ali Akbar) তাঁর 'The Elements of Social Welfare' শিশুর সাতটি মৌলিক চাহিদার কথা উল্লেখ করেছেন-

১. দৈহিক চাহিদা, খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়;
২. পরিবার এবং তার বিকল্প থেকে শিশুকে ভালোবাসা, সেবাযত্ন প্রদান এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
৩. বয়সকালে দায়বদ্ধতার জন্য যথাযথ সামাজিকরণ প্রদান এবং শিক্ষা প্রদান;
৪. দৈহিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থ, ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য পুষ্টি, চিকিৎসা সেবা উপযুক্ত দৈহিক সামাজিক এবং আবেগীয় পরিবেশ;
৫. আবেগীয় এবং দৈহিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য চিত্ত বিনোদন সুবিধা;
৬. চরিত্র গঠন সুবিধা;
৭. দৈহিক অক্ষম, সামাজিকভাবে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ এবং আবেগীয় ভারসাম্যহীনতা বা পঙ্গু শিশুদের জন্য বিশেষ সেবা প্রভৃতি ।

উপরোক্ত আলোচনার শেষে শিশুর যে সব মৌলিক মানবিক চাহিদা পাওয়া যায় তা হচ্ছে-

১) খাদ্য
২) বস্ত্র
৩) বাসস্থান
৪) স্বাস্থ্য
৫) শিক্ষা
৬) চিত্তবিনোদন
৭) স্নেহ ও ভালবাসা
৮) যথাযথ যত্ন
৯) নিরাপত্ত নিশ্চয়তা
১০) সামাজিকরণ
১১) চরিত্র গঠন

৪.৪ বাংলাদেশে শিশুকল্যাণের জন্যে সরকারি কর্মসূচি ঃ (সরকারি শিশু কল্যাণ কর্মসূচি)

৪.৪.১ ভূমিকাঃ শিশুদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্ত ও অন্যান্য প্রয়োজন বিবেচনায় আমাদের দেশে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে। শিশুদের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে স্বল্প মেয়াদী, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহন; বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি তৎপরতার সমন্বয় সাধন এবং বিভিন্ন কর্মসূচি সুসংহতকরণের মধ্যে দিয়ে এ সব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় শিশুনীতি প্রণীত হয়েছে। জাতীয় শিশু নীতির ব্যাপক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের সংগে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তর নিয়োজিত রয়েছে। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিশু ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক ও গণশিক্ষ বিভাগ শিশুকল্যাণের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত শিশুদের বিকাশ, শিক্ষা স্বাস্থ্য স্বার্থরক্ষা ও নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন প্রয়োজন মূখী সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

(১) **সরকারি শিশুসদন ঃ** পূর্বের সরকারি এতিমখানা দুঃস্থ মহিলা ও শিশু সেবা যত্নগুলো সমন্বয় সাধন করে নতুন নাম দেয়া হয়েছে সরকারি শিশু সদন। এ সব শিশু সদনে ৫--১৮ বৎসর বয়সী এতিম দুঃস্থ অসহায় ও অবহেলিত শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষাসহ নিরাপত্ত প্রদান করা হয়ে থাকে। এই সদনে বর্তমানে বাংলাদেশে ৭৩টি শিশু সদনের মাধ্যমে ৯৪০০জন শিশুকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। সরকারি শিশু সদনের উদ্দেশ্য হলো পিতৃহীন বা পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের পারিবারিক পরিবেশে স্নেহ ভালোবাসা ও যত্নের সাথে লালন-পালন করে তাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন, দায়িত্ববোধ ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টিসহ উপযোগী শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। এ সদনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো-

(ক) বিনা খরচে শিশুদের খাবার, আবাসন রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা । এই শিক্ষা এস. এস. সি. পরীক্ষা পর্যন্ত।

(খ) অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতার জন্যে তাদেরকে বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দান। যেমন-সেলাই শিক্ষা, তাঁতের কাজ, হাঁস-মুরগী লালন-পালন, মৎসচাষ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান।

(গ) চিত্ত বিনোধনের জন্যে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড যেমন-নাচ, গান, জাতীয় দিবসগুলিতে কুঁচ-কাওয়াজে অংশগ্রহন, নাটক ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

(ঘ) চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনে উন্নত চিকিৎসার জন্যে অন্যত্রে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

(ঙ) শিশুদের পুর্ণবাসনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। মেয়ে শিশুদের বিবাহের মাধ্যমে অনেক সময় চাকুরির মাধ্যমে, আবার আত্মীয়-স্বজনের নিকট ফেরৎ প্রদান অথবা নিজস্ব কর্মসংস্থানের জন্যে পুঁজি প্রদান।

(২) **ছোটমনি নিবাস (বেবী হোম) ঃ** ১৯৬২ সালে সর্ব প্রথম ঢাকায় আজিমপুর ২৫ আসন বিশিষ্ট একটি বেবীহোম স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮১ সালে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আরো ২টি বেবী হোম কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। বর্তমানে আসন সংখ্যা হচ্ছে এই ৩টি কেন্দ্রে ২২৫জন। এতিম পরিত্যক্ত অবহেলিত, অবাঞ্ছিত ও অসহায় শিশু, যাদের বয়স ০৫ (পাঁচ) বৎসরের নীচে তাদের লালন-পালন করা হয়ে থাকে। পাঁচ বছর পূর্ণ হলে এ সব শিশুদের সরকারি শিশু সদনে স্থানান্তর করা হয়। কেউ এদেরকে পোষ্য হিসেবে গ্রহন করতে চাইলে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে পোষ্য হিসেবে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কোন পরিবার যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এ সব শিশুদের ভারণ-পোষন প্রতিপালন, শিক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয় বহন করে তাদেরকে দত্তক বা পোষ্য হিসেবে নিতে চায় তবে সমাজসেবা অধিদপ্তর উপযুক্ত তদন্তের পর নির্দিষ্টি শর্তে সে সব পরিবারকে দত্তক শিশু নেবার অনুমতি দেন। সাধারণত সন্ত ানহীন দম্পতিদের ক্ষেত্রে এ বিষয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়। এই কেন্দ্র গুলো বিভিন্ন হাসপাতাল, বাসভবন, পুলিশ ও অন্যান্য স্থান থেকে পরিত্যাক্ত ও অসহায় শিশুদের গ্রহন করে। এ কেন্দ্রে শিশুদের যে ধরণের সেবা দিয়ে থাকে তাহলো-

(১) পাঁচ বৎসরের কম বয়সের শিশুদের দৈহিক, মানসিক, পরিচর্যা এবং তাদের উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের জন্য ডাক্তার , নার্স ও আয়া নিয়োজিত থাকে। তাছাড়া ১ জন সমাজকর্মী তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখেন।

(২) শিশুদের থাকা, খাওয়া, কাপড় ইত্যাদি বিনা খরচে সরবরাহ করা হয়। তাদেরকে বিভিন্ন খেলা-ধুলা, বিনোদন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষাদান।

(৩) শিশুদের ০৫ বৎসর পূর্ণ হলে অন্যত্র পূর্নবাসনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

৩) **দিবাকালীন শিশুযত্ন কেন্দ্র ঃ** সমাজসেবা অধিদফতর ১৯৬২ সালে ঢাকার আজিমপুরে ৫০ আসন বিশিষ্ট এই কেন্দ্র চালু করে। এ কেন্দ্রে মাধ্যমে সাধারণত স্বল্প আয়ভূক্ত কর্মজীবি মহিলাদের ৫১০ বৎসরের শিশুদের মায়েদের অনুপস্থিতে দিনের বেলা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় । যে সব মায়েরা অর্থ উপার্জনের জন্যে ঘরের বাইরে কাজ করেন, তারা তাদের ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা ও নিরাপত্তা প্রদানের জন্যে এই কেন্দ্র রেখে যান। আবার অফিস বা কাজ শেষে নিয়ে আসেন। বর্তমানে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও বরিশালে ৪টি দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এ কেন্দ্রের সার্বিক পরিকল্পনায় রয়েছেন একজন সমাজকর্ম সংগঠক। কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কাজ হলো-

ক) শিশুদের দিবাকালীন আহার নিদ্রার ব্যবস্থা করা।

(খ) তাদের উপযুক্ত সামাজিকিকরণের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং খেলা-ধুলা গান বাজনাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

(গ) এ কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুরা বিভিন্ন গঠনমূলক কাজ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ লাভ করে।

(৪) দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পূর্নবাসন কেন্দ্র ঃ ঢাকার জয়দেবপুরের কোণাবাড়ীতে ১৯৮১সালে দুঃস্থ অসহায় ও অবহেলিত শিশুদের কর্মমূখী ও আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে এ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয় । এ কেন্দ্রে ৪০০ জন শিশু থাকার ব্যবস্থা আছে এবং তাদেরকে সুষ্টভাবে পরিচলনার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ৫ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বয়সী দঃস্থ ও পরিত্যক্ত শিশুদের ধরে নিয়ে এ কেন্দ্র ভর্তি করা হয় এবং কর্মমূখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হয় । এ কেন্দ্রে শিশুদের উপার্জনক্ষম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ যেমন- সাইকেল মেরামত, দর্জিকাজ কাঠমিস্ত্রী , অটোমোবাইলস ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ কেন্দ্র ছাড়াও খুলনা, বরিশাল, টঙ্গীপাড়া ও গোপালগঞ্জে অনুরূপ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে।

(৫) সমন্বিত অন্ধশিক্ষা কার্যক্রম ঃ সাধারণত ছাত্রদের পাশা-পাশি অন্ধ শিশুদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করার জন্যে ১৯৭৪ সালে দেশের ৪৭টি জেলায় ৪৭টি সাধারণ বিদ্যালয়ের সাথে সমন্বিতভাবে এ কার্যক্রম চালু করা হয়। দেশে আরো অবশিষ্ট ১৭টি জেলায়ও এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে মোট প্রকল্প ৬৪টি। এতে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (রিসোর্স) শিক্ষকের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি ব্রেইলী পদ্ধতিতে অন্ধ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। প্রতি স্কুলে ১০জন করে অন্ধ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া অন্ধ শিশুদের যথা সম্ভব আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৬) প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষা ও পূর্নবাসন কেন্দ্র ঃ বাংলাদেশে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা ও পূর্নবাসনের জন্য ১৯৬২ সালে ঢাকা, চট্গ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা ৪টি বিভাগীয় শহরে ৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষা, প্রশিক্ষাণ ও পুর্নসাবন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ ছাড়া ১৯৬৫সালে চাঁদপুর ও ফরিদপুরে ও ২টি এবং ১৯৮১ সালে সিলেটে একটি মূক ও বধির বিদ্যালয়ও স্থাপন করা হয়। তাছাড়া চট্টগ্রাম শহরে ১০০ আসন বিশিষ্ট ১টি মানবিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করা হয়। এ সব কেন্দ্রগুলোতে ৫টি অন্ধ স্কুল, ৭টি মূক ও বধির স্কুল এবং ৫টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। মানবিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে চট্টগ্রামে রাউফাবাদে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাইকোথেরাপী, মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট এর প্রচেষ্টা, স্পীচথেরাপী, ফিজিওথেরাপী, সাধারণ শিক্ষা ও সাধারণ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

(৭) জাতীয় সংশোধনী প্রতিষ্ঠান ঃ কিশোর অপরাধমূলক আচরণ সংশোধনের জন্য ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলায় টঙ্গীতে "জাতীয় কিশোর সংশোধন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের প্রেক্ষাপটে এখানে (ক) কিশোর আদালত (খ) কিশোর হাজত (গ) প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে। যে সব কিশোর বিভিন্ন ধরণের অপরাধ করে থাকে তাদেরকে অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। ১ জন প্রবেশন অফিসার ও ১জন মনোবিজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে শিশুদের অপরাধমূলক আচরণ দূর করার জন্যে ব্যক্তি সমাজ কর্ম পদ্ধতির অনুশীলন করা হয়। তাদেরকে সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। এটি ছাড়াও পরবর্তীতে ১৫০ আসন বিশিষ্ট আর একটি কিশোর সংশোধন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে।

(৮) **এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ** (জিয়ানগর, রাঙ্গুনিয়া) সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রথম সমাধিস্থলে রাঙ্গুনিয়াতে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের কল্যাণের লক্ষ্যে একটি কমপ্লেক্স স্থাপন করা হয়েছে। এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি আলোচ্য কমপ্লেক্সের অংশবিশেষ। এখানে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ উপযোগী ৫০জন দরিদ্র এতিম,অসহায় শিশুদের আশ্রয়, যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া বহিরাগত ৫০জন স্থানীয় দুঃস্থ ও দরিদ্র শিশুকে প্রশিক্ষণ সুবিধাদি দেয়া হয়।

(৯) **অনুদান প্রাপ্ত নিবন্ধীকৃত এতিমখানা ঃ** সরকারি প্রচেষ্টার সম্পূরক হিসেব বেসরকারি এতিমখানা গুলো যাতে এতিম শিশুদের লালন-পলন করতে পারে, সে জন্য আর্থিক সহযোগিতা হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয় । সমাজসেবা অধিদপ্তরে ৯০৯টি এতিমখানাকে আর্থিক অনুদান দেয়া হয়।

৪.৫ শিশুকল্যাণ কর্মসূচির প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো হচ্ছে-

(১) **সীমিত কর্মসূচি ঃ** বাংলাদেশে শিশুকল্যাণে গৃহীত প্রত্যক্ষ কার্যক্রমগুলো সম্পূর্ণভাবে শহর কেন্দ্রিক এবং প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই কম, তাছাড়া শহর কেন্দ্রিক শিশুকল্যাণ কর্মসূচি; আবার বিশেষ শ্রেণীর শিশুরা উপকৃত হয়। দেশের আপাময় শিশুদের অর্থাৎ জনসংখ্যার ৪৬.৫% শিশুর জন্যে সরকারি যে স্বল্প সংখ্যক শিশুর জন্যে গৃহীত ব্যবস্থা তা অত্যন্ত নগণ্য।

(২) **অবাস্তব কর্মসূচি ঃ** শিশুদের জন্যে গৃহীত পদক্ষেপ গুলো বেশিরভাগই শিশুদের চাহিদা ও মৌল মানবিক চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত নয়। এতে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ ও জাতীয় শিশুর নীতির প্রেক্ষাপটে শিশুদের শারীরিক, মানসিক, আবেগীয়, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও বিনোদনের সাথে ততটা সরাসরি সর্ম্পকযুক্ত নয়।

(৩) **অসংগঠিত বা সমন্বয়ের অভাব ঃ** বিভিন্ন বিভাগ, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সাহায্যকারি বিদেশী সংস্থা এবং দাতা সংস্থা গুলোর মধ্যে অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই সুষ্ঠ সমন্বয়ের অভাবে শিশুকল্যাণ কর্মসূচিকে আরো জোরদার, অর্থবহ ও কার্যকর করা যাচ্ছে না।

(৪) **প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব ঃ** সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে শিশু কল্যাণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে অর্থের অভাব রয়েছে। সরকারের স্বল্প বরাদ্দ, বরাদ্দকৃত অর্থ প্রাপ্তিতে বিলম্ব এবং অনেক সময় বরাদ্দকৃত অর্থ পরিমান কমানো শিশুকল্যাণ কর্মসূচিকে ব্যাহত করে।

(৫) **জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব ঃ** আমাদের দেশে যারা শিশুকল্যাণ কর্মসূচিতে নিয়োজিত আছেন; তাদের অনেকেই শিশুদের মানসিক ও আবেগীয় বিকাশ শিশুদির পরিচর্যা, শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে ততটা জ্ঞান ও দক্ষতা নেই।

(৬) **সুষ্ঠ তত্ত্বাবধায়নের অভাব ঃ** সরকার পরিচালিত শিশুকল্যাণ কর্মসূচির সুষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ন একেবারেই অনুপস্থিত বিশেষ করে শিশু সদনে এতিমখানায় শিশুদের উপর বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন চালানো হয়ে থাকে। আবার সংশোধনমূলক প্রতিষ্ঠানে সুন্দরভাবে শিশুদের কাউন্সিলিং করা হয় না। কর্মসূচির কার্যকরি করার জন্য অবশ্যই ভালভাবে তদারকি করতে হয়; কিন্তু আমাদের দেশে সেই রকম কার্যকর তদারকির ব্যবস্থা নেই।

(৭) **বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে কর্মসূচির অভাব ঃ** বাংলাদেশে বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী শিশু কিশোরের সংখ্যা ১০ লাখের ওপর। এদের বেশির ভাগ গ্রামে বসবাস করে। এদের জন্যে যে সীমিত সংখ্যক কর্মসূচী রয়েছে তা বড় বড় শহর গুলির মধ্যেই সীমিত। বিপুল সংখ্যক বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী শিশু এই সেবা থেকে বিছন্ন থাকে। তাদের কাছে পৌঁছে না ।

(৮) **আইনের বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা ও জনগণের সচেতনতার অভাব ঃ** বাংলাদেশে শিশুরা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হচ্ছে; এই সব নির্যাতনের হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করার জন্যে যে সব প্রচলিত আইন রয়েছে তার সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না। আইনের জটিলতা ও প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে এই সব আইনগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। অন্যদিকে সাধারণ জনগণ ও শিশুদের ব্যাপারে সচেতন নয় ও দায়িত্বশীল নয়।

অনুশীলনী

(১) শিশু কল্যাণ বলতে কি কি বোঝেন? শিশুদের মৌল মানবিক চাহিদা গুলো আলোচনা করুন।

(২) শিশু কল্যাণের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য সমূহ কি? বাংলাদেশে প্রচলিত সরকারি শিশু কল্যাণ কর্মসূচির সমস্যাগুলো আলোচনা করুন।

(৩) বাংলাদেশে প্রচলিত সরকারি শিশুকল্যাণ কর্মসূচির একটি বিবরণ দিন ।

পাঠ- ৫ ঃ বাংলাদেশে অপরাধ সংশোধন সেবামূলক কার্যক্রম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ অপরাধ সংশোধন সেবা কার্যক্রম কি? এর উদ্দেশ্যসমূহ কি কি?
- ☞ বাংলাদেশে প্রচলিত সংশোধনমূলক কার্মসূচি
- ☞ বাংলাদেশে প্রচলিত সংসোধনমূলক কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা/সমস্যা

ভূমিকা

আধুনিক শিল্প সমাজে অপরাধ ও কিশোর অপরাধীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বয়স্কদের চেয়ে কিশোররা যেহেতু না বুঝে ভুল করে থাকে, তাই তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা বয়স্কদের তুলনায় ভিন্নতর হওয়া উচিত এবং তাঁদের কৃত কর্মের জন্যে শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনের সুযোগ দেয়ার পক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজ বিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানী, সমাজকমীরা এবং মানবতাবাদীরা জোড়ালো মতবাদ দেন। এরই প্রেক্ষাপটে সমাজকর্মের অনুশলীনের ক্ষেত্র হিসেবে সংশোধন কার্যক্রম গ্রহন করা হয় এবং বাংলাদেশে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারিভাবে কিশোর অপরাধীদের অপরাধ, চরিত্র ও আচরণ সংশোধনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে ।

৫.১ অপরাধ সংশোধন সেবা কার্যক্রম কি? এর উদ্দেশ্যসমূহ কি কি?

অপরাধ সংশোধন কার্যক্রম হলো এমন এক ধরনের পেশাদার সেবাকর্ম যেখানে অপরাধীর অপরাধমূলক আচরণ নিরাময় ও নিয়ন্ত্রনে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। **এল. জি. কার্ণে** বলেন- " অপরাধমূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসার জন্য অপরাধ বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগের পেশাদার বিষয়ক সংশোধন বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। সংশোধনের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় বলা যায়, আইন ভঙ্গকারির পুর্নবাসনে সাহায্য করার সার্বিক প্রক্রিয়া হলো সংশোধন । শাস্তির বিপরীত বা বিকল্প উপায় ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধীর অপরাধ প্রবণতা সংশোধন ও পুর্নবাসনের প্রচেষ্টাই সংশোধনমূলক কার্যক্রম। সুতরাং যেসব কার্যাবলি ও ব্যবস্থার মাধ্যমে অপরাধীর আচার-আচরণ ব্যক্তিত্ব , অপরাধ প্রবণতা এবং চরিত্র সংশোধনের প্রচেষ্টা কেই সংশোধমূলক কার্যক্রম বলা হয়। সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী "অপরাধীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা, উপদেশ, নির্দেশনা এবং অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টিকারি কারণ ও অবস্থার পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে অপরাধীর অপরাধ প্রবণতা সংশোধন এবং সমাজের স্বাভাবিক জীবন-যাপনে সক্ষম করে তোলাই সংশোধনমূলক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।"

সংশোধনের উদ্দেশ্যসমূহ

অপরাধ প্রবণতা দূর করার আধূনিক পদ্ধতি হলো সংশোধনমূলক কার্যক্রম। যার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হচ্ছে-

ক) অপরাধীর শাস্তিকে স্থাগিত রাখা এবং শাস্তির পরিবর্তে কিছুটা নিয়ন্ত্রনে রেখে সংশোধন করার ব্যবস্থা করা।

খ) অপারাধীর ব্যক্তিত্ব গঠন, চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা এবং অপরাধীর সাথে জড়িত কারণসমূহ খুঁজে বের করে তা নিরাময়ের ব্যবস্থা করা।

গ) অপরাধীকে নিজস্ব পারিবারিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডেলে চরিত্র সংশোধন করার সুযোগ দেয়া;

ঘ) সামাজিক কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করা এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা প্রদান;

ঙ) আইনের জটিলতায় অনেক সময় নিরাপরাধী ব্যক্তিকে শাস্তি ভোগ করতে হয় ফলশ্রুতিতে সমাজের প্রতি ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি নৈতিবাচক হয়ে থাকে এবং তার মধ্যে প্রতিহিংসা প্রবণতার সৃষ্টি হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক কর্মসুচি তা রোধ করে থাকে।

চ) কারা ব্যবস্থায় অনেক সময় কাঁচা অপরাধী পাকা অপরাধীদের সংস্পর্শে এসে অপরাধের আরো নতুন নতুন কৌশল শিখে থাকে। অপরাধমূলক আচরণ সংশোধনের জন্যে জেলখানার পরিবেশ কখনও উপযোগী নয়। এ ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে অপরাধীকে নতুন অপরাধ শেখার কৌশল ও তিক্ত জেলখানার অভিজ্ঞতা থেকে রেহাই দিয়ে থাকে।

(ছ) সংশোধনমূলক কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরাধী যদি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য হন তাহলে তাঁর পরিবার আর্থিক দিক দিয়ে দারুণ সমস্যার সম্মুখীন হবে। যদি তাঁকে শাস্তি প্রদান করা হয় পরিবারের উপার্জক্ষ

ব্যক্তির উপর নির্ভরশীলদের যাতে কোন সমস্যা না হয় তার জন্যে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে জেলখানার বাইরে রেখে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে অপরাধীর চরিত্র সংশোধন করা।

(জ) কারাগারে অনেক কয়েদীদের জন্য সরকাররের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, তাঁদের ভরণ-পোষণ ও স্থান সংকুলানের জন্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই সংশোধনমূলক কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরাধীর নিজস্ব খরচে যতদূর সম্ভব প্রশাসনের খরচ কমিয়ে তাকে সংশোধনের ব্যবস্থা করা।

৫.২ বাংলাদেশে প্রচলিত সংশোধনমূলক কার্যসূচী

বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কর্যক্রম ১৯৪৯ সালে সাবেক পাকিস্তান আমল থেকে বাস্তবায়ন শুরু হয়। ১৯৪৯সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঢাকার অদূরের মুড়া পাড়ার বোরস্টাল স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে সংশোধন কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৬০সালে প্রবেশন অব অফেন্ডারস অডিন্যান্স প্রণয়নের মধ্য দিয়ে সংশোধনমূলক কার্যক্রম প্রবর্তনের আইনগত ভিত্তি রচিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রবেশন, আফটার কেয়ার সার্ভিস কার্যক্রম, কিশোর অপরাধ সংশোধন কেন্দ্র -এ তিনটি কার্যক্রমের মাধ্যমে অপরাধমূলক আচরণ সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহন করেছে।

১) **প্রবেশন কার্যক্রম ঃ** অপরাধ সংশোধনে অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদ্ধতি হচেছ প্রবেশন। পাকিস্তান আমলে ১৯৬০সালের প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স জারি হবার পার ১৯৬২সালে তদানীন্তন পরিকল্পনার অধীনে আমাদের দেশে সীমিতভাবে এ কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে ২২জন প্রবেশন অফিসারের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ২২টি প্রবেশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সাধারণত প্রবেশন বলতে এমন এক ধরণের সেবাকর্ম বুঝায় যেখানে অপরাধী পূর্বে কোন অপরাধ না করে থাকে এবং তার শাস্তি যদি দু'বছর মেয়াদের অধিক না হয় তবে অপরাধীর শারিরীক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থা, বিবেচনা করে তাকে প্রবেশনের আওতায় নির্ধারিত শর্তে অপরাধ সংশোধনের সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। নিম্নের বৈশিষ্ট্যাধারী অপরাধী চরিত্র সংশোধনের জন্যে প্রবেশনের সুযোগ পেয়ে থাকবে।

   ক) আইন বা আদালত কর্তৃক দোষী ব্যক্তির অপরাধের পূর্ব রেকর্ড না থাকা।

   খ) অপরাধের শাস্তি ২বছরেরর বেশি না হওয়া;

   গ) বয়স, দৈহিক, মানসিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রবেশনের অনুকুল হওয়া। সে সেব শর্তের অধীনে একজন অপরাধীকে প্রবেশনের সুযোগ প্রদান করা হয়ে থাকে; তা হলো-

      ১) অপরাধকে এক থেকে তিন বছর সময়ের মধ্যে আদালত দ্বারা নির্ধারিত সময়ের জন্য একজন প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে;

      ২) অপরাধী পুনরায় কোন অপরাধমূলক আচরণ প্রদর্শন করতে পারবে না এবং সকলের সাথে সদ্ভাব রেখে চলবে;

      ৩) অপরাধী প্রবেশন অফিসারের বিনানুমতিতে বাসস্থান ও কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবে না। বাংলাদেশে প্রবেশন কার্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে নিম্নরূপ:

         ১) অপরাধীর অপরাধের সাথে জড়িত পারিবারিক সামাজিক ও মনস্থাত্তিক কারণগুলো উদ্‌ঘাটন করে সংশোধনের সুযোগ করে দেয়া।

         ২) কারাগারের খারাপ পরিবেশ থেকে দূরে রাখা;

         ৩) সামান্য ভুলের জন্যে অপরাধীকে আসামী হিসেবে চিহ্নিত না করা যাতে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন না হয়।

         ৪) অপরাধীকে প্রথমবারের মত আত্মশুদ্ধির সুযোগ দিয়ে সহায়তা করা।

         ৫) সমাজে অপরাধীকে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন সুনাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ সৃষ্টি করা;

         ৬) অপরাধীর পিতা-মাতা প্রতিবেশীদের মন হতে বিরূপ মনোভাব দূর করে, তাদেরকে অপরাধীর প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলা;

         ৭) অপরাধীকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যে নিয়োজিত করে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা।

         ৮) অপরাধের প্রতি ঘৃনা সৃষ্টি করা এবং তাঁর মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টি করে অপরাধ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা।

বাংলাদেশে প্রবেশন মঞ্জুরের প্রক্রিয়া

প্রবেশন পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তি আইনের দৃষ্টিতে যখন দোষী সাব্যস্ত হয়; তখন বিচারক চূড়ান্ত বিচার স্থগিত রেখে কর্তব্যরত প্রবেশন অফিসারকে অপরাধীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থ অনুসন্ধান করে প্রবেশন বিধির নিয়ম অনুযায়ী একটি বিস্তারিত প্রাক-দন্ডাদেশ রিপোর্ট করতে বলেন। প্রবেশন অফিসার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অপরাধীর চরিত্র, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবার ও পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে তার সম্পর্ক ইত্যাদি তদন্ত করেন। তদন্ত করে প্রবেশন অফিসার যদি বুঝতে পারেন অপরাধীকে সংশোধনের আওতায় আনা যায়; তাহলে তিনি প্রবেশনের জন্যে সুপারিশ করেন। উক্ত সুপারিশের উপর ভিত্তি করে বিচারক প্রবেশন মঞ্জুর করে থাকেন।

(২) আফটার কেয়ার সার্ভিস

১৯৬০ সালে প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অডিন্যান্স এর আওতায় ১৯৬২সাল এটি প্রবেশন কার্যক্রম সাথে একত্রিভূত করা হয়। বর্তমানে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে প্রবেশনের সংঙ্গে ২২টি ইউনিটে আফটার কেয়ার সার্ভিস বাস্তবায়িত হচ্ছে। আফটার কেয়ার সার্ভিস হচেছ দীর্ঘদিন জেল খাটার পর কয়েদীরা যখন মুক্তি পায়; তখন দেখা যায় সমাজে তাঁদের স্বাভাবিক বসবাসের নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয় তাই এ কার্যক্রমে নিয়োজিত অফিসার মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক মনস্তাত্ত্বিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে সমাজের অন্যান্য মানুষের মতো স্বাভাবিক বসবাস করার ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশে আফটার কেয়ার সার্ভিসের উদ্দেশ্যাবলী হলো নিম্নরূপ:

১) মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুর্নবাসনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

২) আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য যে সকল অপরাধী আদালতে জামিন লাভ বা আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যর্থ হয় তাদেরকে সহায়তা করা।

৩) প্রয়োজন বোধে মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদের এককালীন আর্থিক সাহায্য দিয়ে স্বকর্মসংস্থানে সহায়তা করা;

৪) কয়েদীদের আত্নীয়-স্বজনের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে এবং কয়েদীদের প্রতি সমাজের নৈতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দূর করা।

৫) অনেক সময় কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে চাকুরীর মাধ্যমে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা;

৬) কারাগারের অভ্যন্তরে কয়েদীদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নিজস্ব আগ্রহের প্রতিলক্ষ্য রেখে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৭) কারাগারে কয়েদীদের ধর্মীয় শিক্ষা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

৮) কয়েদীদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতিকল্পে বিনোদনমূলক কর্মসূচি গ্রহন করা।

প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস শুরু হবার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অপরাধীকে মুক্তি দেয়া হয়েছে এবং আফটার কেয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

(৩) কিশোর অপরাধী সংশোধনী প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪ এর অধীনে ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে ১৯৭৬ সালে ১টি কিশোর আদালত, ১টি কিশোর হাজত এবং ১টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সমন্বয়ে " জাতীয় কিশোর অপরাধ সংশোধন ইনস্টিটিউট" প্রতিষ্ঠা করা হয় । ১৯৭৮ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালু হয়। ১৯৯৫সালের সমাজসেবা অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী এ পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩,৫০৯জন কিশোর অপরাধীকে সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের আসন সংখ্যা হচ্ছে ২০০জনের। একজন তত্ত্বাবধায়ক ও কয়েকজন ব্যক্তি সমাজকর্মী এর মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে থাকে। ১৯৭৪সালের শিশু আইনে কিশোর অপরাধীদের বিশেষ হেফাজতে বিশেষ জেলখানায় রাখার কথা বলা হয় এবং ঘরোয়া পরিবেশে পৃথক বিচারের কথা উল্লেখ করা হয়। তারই প্রেক্ষপটে আলাদাভাবে কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্যে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্যগুলো হচ্ছে-

(ক) কিশোরদের শাস্তি নয় সংশোধনই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য;

(খ) আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিশোরদের সংশোধনের ব্যবস্থা করা;

(গ) কিশোর অপরাধীদের বিচারকর্ম বয়স্ক অপরাধীদের মত পরিচালনা না করে পৃথকভাবে গঠিত কিশোর আদালতে বিচার কার্য সম্পন্ন করা এবং অপরাধী সাব্যস্ত হলে কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে রাখা;

(ঘ) কিশোর অপরাধীদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষতার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা ও সর্বাত্মক সহযোগিতা করা;

(ঙ) অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বীতা অর্জনের জন্যে বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণদান;

(চ) খেলা-ধুলা, গান-বাজনা, শরীরচর্চা ও চিত্ত-বিনোদনের মাধ্যমে কিশোরদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন ও শৃংখলা নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানদান;

(ছ) অপরাধের পনুরাবৃত্তি থেকে কিশোরদের রক্ষাকরণ;

বাংলাদেশে কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কর্মকান্ড নিম্নে ৩টি প্রধান ভাগে পরিচালিত হচ্ছে-

(ক) কিশোর আদালত (খ) কিশোর হাজত ও (গ) সংশোধনী প্রতিষ্ঠান

(ক) কিশোর আদালত ঃ ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের প্রেক্ষাপটে গঠিত বিশেষ ধরণের আদালতই কিশোর আদালত। প্রথম শ্রেণীর একজন ম্যাজিস্ট্রেট, সমাজকর্মী, মনোবিজ্ঞানী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মচারীর সমন্বয়ে এই আদালত গঠিত হয়। এখানে সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট সমাজকর্মী, মনোচিকিৎসক, অপরাধীর পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে কিশোর অপরাধীর অপরাধের সার্বিক দিক বিশ্লেষণ করে সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। এখানে কিশোরদের বিচারকার্য পরিচালনা শাস্তি প্রদানের জন্যে পরিচালিত হয় না। বিচারকার্য এর মাধ্যমে বিচারক নির্ধারণ করেন অপরাধীর চরিত্র সংশোধনে অপরাধীকে পিতা-মাতার অধীনে প্রবেশনের সুযোগ দিবেন, নাকি সংশোধনমূলক প্রতিষ্ঠানে রাখবেন। এই আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে অপরাধীকে কোন বিচারক নিয়োগ করতে হয় না। আদালত কর্তৃক অপরাধের কারণ নির্ণয় অপরাধী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং এ সব তথ্যের আলোকে কিশোর অপরাধীর চরিত্র সংশোধন ও পুর্নবাসনই মূল লক্ষ্য।

সুতরাং কিশোর আদালতে গোপনীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে অনুসন্ধান, শুনানী ও কিশোর অপরাধীদের পুর্নবাসনের লক্ষ্য নিয়ে বিচারকর্য সম্পাদন করা হয়।

কিশোর আদালতের গুরুত্ব ও সুবিধা

ক) এই আদালত কিশোরদের অপরাধের সাথে যেসব কারণ জড়িত তা অনসন্ধান করে তা থেকে তাদেরকে মুক্ত করতে চেষ্টা করে থাকে।

খ) অত্যন্ত গোপনীয় ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বিচার কার্য সম্পন্ন করা হয় বলে তাতে কিশোররা সামাজিক ও মানসিকভাবে স্বাভাবিক থাকে।

গ) কিশোর আদালতে অপরাধকে দন্ডবিধির অধীনে তালিকভূক্ত করা হয় না বিধায় অপরাধী ভবিষ্যতে সকল নাগরিক অধিকর লাভ থেকে বঞ্চিত হয় না।

ঘ) বয়স্ক আদালতের ন্যায় বার বার কোর্টে হাজিরা বা উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না।

ঙ) এই আদালতই অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে অপরাধীদের বিচারকার্য সম্পন্ন করে এবং সংশোধনের সুযোগ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করে থাকে।

খ) কিশোর হাজত ঃ জাতীয় কিশোর অপরাধ সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অংগ হচ্ছে আটক নিবাস বা কিশোর হাজত। কিশোর অপরাধীদের বিচারের পূর্বে বা বিচার চলাকালীন সময়ে অথবা বিচারের পর সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত যেখানে রাখা হয়; তাকেই আটক নিবাস বলা হয়। সাধারণ জেলখানার খারাপ পরিবেশ থেকে শিশুদের রক্ষা করার জন্য এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে কিশোর অপরাধীদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়।

গ) প্রশিক্ষণকেন্দ্র বা সংশোধনী প্রতিষ্ঠান ঃ এটি কিশোর অপরাধ সংশোধনের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বিচারে দোষী সাব্যস্ত এবং প্রতিষ্ঠানিক সংশোধনের প্রয়োজন হলে অপরাধী কিশোরদের এখানে রাখা হয়। এখানে আনয়নের পর অপরাধ প্রবন কিশোরদের যাবতীয় দায়িত্ব এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃকপক্ষ গ্রহন করে থাকে। কিশোরদের সংশোধনের জন্য কেন্দ্র অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সমাজকর্মী রয়েছে; যারা নিবাসীদরে সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন এবং ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুসরণ করে সংশোধনের জন্য একটি সংশোধনী পরিকল্পনা তৈরি করেন। কেন্দ্রে অবস্থানরত নিবাসীদের জন্য দৈনন্দিন কর্মসূচির একটি তালিকা রয়েছে যা তাদেরকে অনুসরণ করতে হয়। সাধারণ শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার পাশা-পাশি তাদেরকে নিয়মিত শরীর চর্চা, খেলা-ধুলা ও চিত্তবিনোদন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের দৈহিক, মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। তাছাড়া নিবাসীদের আগ্রহ বুদ্ধিমত্তার উপর করে তাদেরকে বিভিন্ন ট্রেড প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কারিগরি শিক্ষার মধ্যে রয়েছে- দর্জি বিদ্যা,

কার্পেন্টারী, বৈদ্যুতিক ওয়েল্ডিং ও অটোমোবাইল ইত্যাদি। কেন্দ্রে সুশৃংখল জীবন-যাপন ও সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতির ফলে নিবাসীদের আচার-আচরণ ও সংশোধনের আমুল পরিবর্তন ঘটে থাকে।

৫.৩ সংশোধন কার্যক্রমের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশে অপরাধ সংশোধনি কার্যক্রমসমূহঃ
যে সব সমস্যার সম্মুখীন তা হচ্ছে-

১) প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সীমিত কার্যক্রম ও অপর্যাপ্ত সংশোধনমূলক সুযোগ-সুবিধা;
২) সংশোধনী কার্যক্রমে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞের অভাব এবং অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ;
৩) পুলিশ কর্তৃপক্ষ সংশোধনমূলক কার্যক্রমের কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব;
৪) কার্যক্রম বাস্তবায়নে পেশাদার সমাজকর্মীর অভাব;
৫) প্রশাসনিক জটিলতার দীর্ঘসুত্রিতা;
৬) সংশোধনী কার্যক্রমের সাথে জড়িত আইন, স্বরাষ্ট্র এব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পারস্পরিক সমঝোতা ও সমন্বয়ের অভাব;
৭) সমষ্টি ভিত্তিক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের উদ্যোগের অভাব;
৮) অক্ষম কিশোর অপরাধীদের পূর্নবাসনের ও সংশোধনের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই।
৯) গ্রামীণ এলাকার জন্যে সংশোধনী প্রতিষ্ঠান একেবারেই অনুপস্থিতি;
১০) অপরাধ সংশোধনে ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রমে ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে সরকারের প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা ও আর্থিক বরাদ্দ সীমাবদ্ধতা;
১১) অপরাধ সংশোধনের জন্যে নিয়মিত কার্যক্রমের মূল্যায়নের অভাব ও ফলো-আপের অভাব;

অনুশীলনী

সম্ভাব্য প্রশ্ন উত্তর

১) অপরাধ সংশোধন কার্যক্রম বলতে কি বোঝ? অপরাধ কার্যক্রম সংশোধনের উদ্দেশ্যগুলো কি?
২) বাংলাদেশে অপরাধ সংশোধন কার্যক্রমগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। এই কর্মসূচির কি কি সমস্যা রয়েছে?

পাঠ- ৬ ঃ বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা: এর ধরণ ও প্রকারভেদ;
- ☞ বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচীসমূহের বিবরণ;
- ☞ প্রতিবন্ধী কর্মসূচিসমূহের সমস্যা

ভূমিকা

শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সীমাবদ্ধতার কারণে সাধারণ মানুষের মত যারা স্বাভাবিক সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারে না সাধারণতঃ তাদেরকে আমরা প্রতিবন্ধী বলে থাকি। অতীতকাল থেকেই প্রতিবন্ধীদের জন্যে বিভিন্ন সেবামূলক তৎপরতা থাকলেও তা বিজ্ঞানসম্মত না হওয়ায় বর্তমানে পূর্বেকার ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন করে আধূনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিভিত্তিক সেবা সুবিধার প্রচলন ঘটেছে। বর্তমানে প্রতিবন্ধীদের সমস্যা ও তাঁর সমাধানের লক্ষ্যে সরকার পরিচালিত উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রমগুলো এ পাঠে আলোচনা করা হলো।

৬.১ প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা এর ধরণ ও প্রকারভেদ

প্রতিবন্ধী বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়; যারা দৈহিক, মানসিক এবং বোধশক্তিজনিত দিক থেকে অসুবিধাগ্রস্ততার কারণে সমাজে স্বাভাবিক সামাজিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপন থেকে বঞ্চিত। ইউনিসেফ (টঘওঈউচ) প্রতিবন্ধীতাকে "অক্ষমতা" (উরংধনষরঃু) এবং "বিকলাংগতা" (ঐধহফরপধঢ়) প্রত্যয় দু'টির সংজ্ঞার মাধ্যমে ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। "অক্ষমতা" প্রতিবন্ধী বলতে দৃষ্টি, বাক, শ্রবণ, লিখন, বোধশক্তি বা অন্য যে কোন ধরণের অসুবিধাকে বুঝায়; যেগুলো স্বাভাবিক জীবনের পরিপন্থী বা প্রতিবন্ধক।

অন্যদিকে "বিকলাঙ্গতা" হলো এমন এক ধরণের অক্ষমতা যা নির্দিষ্ট কোন বয়সের জন্য বাঞ্ছিত ও প্রত্যাশিত স্বাভাবিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্ট করে। জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডঐঙ) ৩টি ধাপের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীতার সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করেছে। তাহলো নিম্নরূপ:

ক) **শারীরিক কার্যগত সীমাবদ্ধতা ঃ** একজন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও শারীরিক বৃত্তীয় কার্যগত সীমাবদ্ধতা;

খ) **প্রতিবন্ধীতা ঃ** যে কোন শারীরিক কার্যগত সীমাবদ্ধতার কারণে অন্য অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির মতো যিনি তার সম্ভাবনা মেধা এবং যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে বাঁধাগ্রস্থ হন।

গ) **সীমাবদ্ধতাঃ** শারীরিক কার্যগত সীমাবদ্ধতা বা প্রতিবন্ধীতার কারণে যে ব্যক্তি তার বয়স, যোগ্যতা, সামাজিক প্রতিপত্তি, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নারী পুরুষের সমঅধিকারসহ সব ধরণের মৌলিক মানবাধিকার থেকে যিনি বঞ্চিত। নাগরিক জীবনের অধিকার আদায় ও দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে যিনি বৈষম্যের শিকার।

সুতরাং প্রতিবন্ধীতা দৈহিক সীমাবদ্ধতা বা পঙ্গুত্ব, মানসিক সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি এবং সমাজিক অসুবিধার কারণে স্বাভাবিক সামাজিক ভূমিকা পালনে অক্ষমতাই প্রতিবন্ধীতা। সাধারণতঃ শারীরিক প্রতিবন্ধীতা হচ্ছে শারীরিকভাবে যে কোন অংশের পঙ্গুত্ব, বিকলাঙ্গতা বা অসুস্থতা। দেখা, শুনা, বলা, লেখা, বোধশক্তির অভাব, অঙ্গ সঞ্চালন বা অন্য কোন দৈহিক ত্র*টির* জন্যে যে ত্রুটি/সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। মানসিক প্রতিবন্ধীতা হলো জড়বুদ্ধিতা বা মানসিক বৈকল্য; ভারসাম্যহীনতার কারণে ব্যক্তির মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। অন্য দিকে সামাজিক প্রতিবন্ধতা হলো সামাজিক পরিস্থিতি জনিত অসুবিধার কারণে ব্যক্তি সঠিক সামাজিক ভূমিকা পালনে নিজ অপরাগতাজনিত সীমাবদ্ধতা। সুতরাং প্রতিবন্ধী তাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারিঃ

১) শারীরিক প্রতিবন্ধী
২) মানসিক প্রতিবন্ধী
৩) সামাজিক প্রতিবন্ধী

প্রতিবন্ধীদের উপার্জনক্ষম করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে সহায়তা করার জন্য গৃহীত কার্যক্রমই প্রতিবনধী কল্যাণ কর্মসূচী হিসেবে পরিচিত। সাধারণতঃ প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান ও সমাজে আর্থ সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করার জন্য প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচী গ্রহন করা হয়।

৬.২ বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচি সমূহের বিবরণ

আমাদের দেশে সমাজসেবা অধিদফতরের নিয়ন্ত্রণে বাস্তবায়িত সরকারি দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুর্নবাসনের কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

৬.৩ প্রতিবন্ধী কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা ও সমস্যাবলী

বাংলাদেশে বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ হিসেবে পরিচিত। এ দেশে বিভিন্ন আর্থ-সামজিক ও মানবিক সমস্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা বাংলাদেশে মোট জন সমষ্টির ১০ভাগ হচ্ছে- কোননা কোনভাবে প্রতিবন্ধী। সেই হিসেবে ১কোটি ৩২লাখ মানুষই আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী। কিন্তু সরকারিভাবে প্রতিবন্ধীদের জন্যে যে সব কর্মসূচি নিয়েছে তা কেবলমাত্রই নামে মাত্র। এ দেশের পঙ্গু ও প্রতিবন্ধীরা শিক্ষা, চাকুরি , ব্যবসা ও সমাজিক কর্মকান্ড থেকে বঞ্চিত। তাদের বেঁচে থাকার অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রাপ্তির দাবী, প্রতিভা বিকাশের ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ-সুবিধা সংবিধান ও নীতিমালায় থাকলেও তা বাস্তবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে সরকার আজও পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহন করেননি। বাংলাদেশে গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে পঙ্গুকল্যাণে নিম্নোক্ত সমস্যাবলী স্পষ্ট হয়ে ওঠেঃ

১) প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানগত তথ্যের অভাব। প্রতিবন্ধীদের ধরণ ও পরিমানগত অবস্থা সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

২) প্রতিবন্ধী কল্যাণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও পরিকল্পনার অভাব।

৩) ব্যাপক ও সমষ্টিভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহনে সরকারের উদাসীনতা ও আর্থিক কম বরাদ্দ দান।

৪) প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুর্নবাসনে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয়ের অভাব।

৫) পঙ্গু কল্যাণ পুর্নবাসন সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতা, সচেতনতার অভাব। প্রতিবন্ধীদের প্রতি নৈতিবাচক ও করুণানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি।

৬) প্রতিবন্ধীদের পড়াশুনার জন্যে প্রচলিত ব্রেইল পদ্ধতির অনুশীলনের ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধীদের জন্যে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের অভাব। বাংলাদেশে ১টি মাত্র ব্রেইল পদ্ধতি চালু রয়েছে যার মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৭) প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের মাধমে তাদেরকে উপার্জনকারী নাগরিক রূপে গড়ে তোলার অভাব। কারণ যে সব স্থানে বৃত্তিমূলক কার্যক্রম রয়েছে অত্যন্ত নিম্নমানের ও সীমিত।

৮) প্রতিবন্ধীদের জন্যে বিনোদনমূলক কার্যক্রমের অভাব এবং তাদের জন্যে অন্যান্য সহায়ক সেবা যেমন- খেলা-ধুলার ব্যবস্থা, পাঠাগার, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদির যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

৯) মহিলা প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি।

অনুশীলনী

সম্ভাব্য প্রশ্ন উত্তর

(১) প্রতিবন্ধী কি? প্রতিবন্ধী কয় ধরণের ও কি কি? ব্যাখ্যা করুন।

(২) প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা দিন। বাংলাদেশে প্রচলিত প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচির বিবরণ দিন। প্রতিবন্ধী কর্মসূচির সমস্যা গুলি কি?

পাঠ- ৭ ঃ হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ হাসপাতাল সমাজসেবা কি? হাসপাতাল সামাজসেবার পটভূমি;
- ☞ হাসপাতাল সমাজসেবার উদ্দেশ্যসমূহ;
- ☞ বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজ সেবাসমূহ;

ভূমিকা

হাসপাতলে রোগীদের রোগ নিরাময় ও চিকিৎসা জনিত সেবা প্রদানের জন্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচী উন্নত দেশের মত বাংলাদেশেও চালু রয়েছে। এ পাঠে হাসপাতাল সমাজসেবা কি, কিভাবে হাসপাতাল সমাজ সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয় এর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

৭.১ হাসপাতাল সমাজসেবা কী?

উন্নত দেশে হাসপাতল সমাজসেবাকে চিকিৎসা সমাজকর্ম বলে অভিহিত করে থাকে। আমাদের দেশে চিকিৎসা সমাজকর্মকে হাসপাতাল সমাজ সেবা হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সমাজ কর্মের বিশেষ একটি প্রয়োগক্ষেত্র হচেছ চিকিৎসা সমাজকর্ম। এখন আসা যাক, চিকিৎসা সমাজ কর্ম কি? ফারগুসনের মতে, চিকিৎসা সমাজকর্ম হলো স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় সাহায্য করার জন্য সমাজকর্মের মৌলিক নীতি ও কৌশলের অনুশীলন সেরাকর্ম।

মনীষী **আর. এ. স্কীডমোর এবং এম. জি. থ্যাকারীর মতে**, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং পদ্ধতি প্রয়োগ করাকে চিকিৎসা সমাজকর্ম বলে।

সুতরাং হাসপাতাল সমাজসেবা (চিকিৎসা সমাজকর্ম) হলো সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা নির্ভর এমন এক ধরনের সেবাকর্ম যার মাধ্যমে রোগীর জন্য হাসপতাল প্রদত্ত চিকিৎসা কার্যক্রমকে কার্যকর করে তোলা হয়; রোগের সাথে জড়িত বিভিন্ন মনো- সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ মোকাবিলায় সাহায্য করে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং চিকিৎসান্তোর পর্যায়ে হাসপাতাল ত্যাগের পর রোগীকে সামাজিকভাবে পুর্নবাসনে সহায়তা করা হয়।

হাসপাতালে পেশাদার সমাজসেবায় নিয়োজিত কর্মীকে চিকিৎসা সমাজকর্মী বলা হয়। এই হাসপাতল সমাজসেবা প্রকৃতিগতভাবে প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক সেবাকর্ম এবং এই সেবাকর্মে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি অনূশীলন করা হয়ে থাকে।

হাসপাতাল সমাজ সেবার (চিকিৎসা সমাজকর্মের) পটভূমি

চিকিৎসা সমাজকর্মের **প্রথম উৎস** ১৮৮০সালে ইংল্যান্ডে মানসিক রোগীদের রোগমুক্তির পর তাদেরকে বাড়ীতে গিয়ে পরিদর্শন করা যাতে পনুরায় কোন রোগে আক্রমন না হয় ।

দ্বিতীয় উৎস ঃ ১৮৯০সালে স্যার চালর্স এস. লক এর উৎসাহে লন্ডনের লেডী এলমনার্স কর্তৃক রোগীদের সামাজকি অনুসন্ধ্যান পরিচালনা অর্থাৎ রোগীদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধ্যান করে রোগীর কি ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন তা নির্ণয়।

তৃতীয় উৎস ঃ ১৮৯৩সালে আমেরিকায় পরিদর্শক সেবিকাগণ কর্তৃক গরীব রোগীদের খরচ বহন করা । যারা চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ অক্ষম তাদের গৃহ পরিদর্শন করা ও অসুস্থতার সামাজিক ও ব্যক্তিগত দিক চিহ্নিত করা।

চতুর্থ উৎস ঃ ১৯০২সালে জন হপকিন্স শিক্ষার অংশ হিসেবে সামাজিক আবেগীয় সমস্যা অন্তর্ভূক্ত করার উদ্যোগ গ্রহন করেন। তিনি তার ছাত্রদের বিভিন্ন এজেন্সীতে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ কারর অনুরোধ করেন- যাতে তারা রোগের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়। উপরোক্ত ৪টি অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ১৯০৫ সালে চিকিৎসা সমাজকর্ম সর্ব প্রথম আমেরিকায় শুরু হয়। সমাজকর্মীদের একই সময়ে ম্যাসাসুয়েটস, নিউইয়র্ক বোস্টন এবং জন হপকিন্স হাসপাতালের স্টাফ হিসেবে সমাজকর্মীরা রোগীর সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের সঠিক তথ্য সরবরাহ করে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় ডাক্তারদের বিশেষভাবে সাহায্য করে।

বাংলাদেশে ১৯৫৯সালে রেডক্রসের আর্থিক সাহায্যে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের তত্ত্বাবধানে ঢাকা মেডিকেল কলেজে সর্ব প্রথম চিকিৎসা সমাজকর্ম চালূ হয়। পরে ১৯৬১সালে এ কার্যক্রমকে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরের আওতাভূক্ত করা হয় ও সরকারি কার্যক্রম হিসেবে বড় বড় হাসপাতাল গুলোতে চালু হয়। ১৯৮৪সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় হাসপাতাল সমাজসেবা। বর্তমানে সারা বাংলাদেশে সর্বমোট ৬৪টি জেলায় ৮৪টি হাসপাতালে এ কার্যক্রম চালূ রয়েছে।

৭.২ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যাবলী

চিকিৎসা সমাজকর্মের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হলো, চিকিৎসাধীন রোগীর সমাজ, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত সকলদিক অনুসন্ধান পূর্বক হাসপাতাল, চিকিৎসক, নার্সসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে যথাযথ চিকিৎস প্রদানে সহায়তা করা। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবার মুখ্য উদ্দেশ্য গুলো হচ্ছে-

১) রোগের সাথে জড়িত ব্যক্তিগত সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও অন্যান্য সকলদিকের তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা চিকিৎসকগণকে অবহিত করণ।

২) রোগীর মানসিক দিকের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে রোগীর সুস্থতা বিধানে সচেষ্ট হওয়া;

৩) দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং অসচেতন রোগীদের হাসপতালে ভর্তিকরণে সহায়তা প্রদান।

৪) রোগের ধরণ অনুযায়ীা সংশ্লিষ্ট বিভাগ, চিকিৎসক, নার্সের ব্যবস্থাকরণ;

৫) রোগের সাথে জড়িত সকল উপাদান সম্পর্কে অবহিতকরণের মাধ্যমে যথাযথ রোগ নির্ণয়ে ও চিকিৎসা পরিকল্পনা প্রণয়নে ডাক্তার ও ব্যবস্থাপনপাকে সাহয্য করা।

৬) রোগী, ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনে সহায়তাকরণ। হাসপাতালের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করণ।

৭) গরীব রোগীদের ঔষধ পথ্য, রক্ত, কৃত্রিম অঙ্গ, চশমাসহ বিভিন্ন ধরণের সহায়তা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

৮) নিয়মিত ও নিয়মানুযায়ী খাবার গ্রহন ও ঔষধ গ্রহনে সহায়তা করণ।

৯) অপারেশনে ভীতিগ্রস্থ রোগীদের মোটিভেশনের মাধ্যমে মানসিকভাবে অপারেশন করার জন্যে প্রস্তুত করে তোলা; মানসিক সান্ত্বনা ও সাহস যোগান।

১০) দীর্ঘ মেয়াদী চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগীর সাথে পরিবারবর্গের যোগাযোগ রক্ষা করতে সাহায্য করা। আত্নীয় স্বজনের খোজ-খবর দেয়া এবং রোগীর কোন প্রয়োজন হলে তা জানানোর ব্যবস্থা করা।

১১) চিকিৎসাত্তোর সেবাদান করে রোগের পুনরাক্রমন রোধ এবং রোগীকে আর্থ-সামাজিকভাবে পুর্নবাসিত করে স্বাভাবিক জীবন-যাপনে সক্ষম করে তুলতে সহায়তাদান।

১২) স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৭.৩ বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম

বাংলাদেশে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক ৮৪টি হাসপাতাল ইউনিটে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিটি হাসপাতালে এ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য একজন পেশাদার দৃঢ় সামজসেবা কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন। তিনি রোগীদের সাক্ষৎকার গ্রহন রোগীর মন থেকে অহেতুক ভয়তীতি দূর করা রোগ সম্পর্কে সচেতন করা; যথাসময়ে সার্বিক চিকিৎসা গ্রহনে সচেতন করা; প্রয়োজনমত রোগীর পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করা এবং ভর্তিকৃত রোগীর কেস রেকর্ড করা ও ফলো-আপ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তাকে দাপ্তরিক কাজে সহায়তা করেন ১জন উ*চমান সহকারী ও ১জন দারোয়ান*-কাম- পিয়ন। সমগ্র বাংলাদেশে এই কর্ম সূচির তত্ত্বাবধান করেন ১জন উপ-পরিচালক ও ১জন প্রধান হাসপাতাল সমাজসেবা অফিসার। হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমকে আর্থিক, সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকে কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য "প্রতিটি হাসপাতালে সরকারি উদ্যোগের সাথে বেসরকারি সহায়তা সম্পৃক্ত করার জন্যে রোগী কল্যাণ সমিতি রয়েছে।

নিম্নে বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবার কর্মসূচিসমূহের ধরণ আলোচনা করা হলো-

১. **রোগীর ভর্তিকরণ ও হাসপাতালের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তাকরণ ঃ** হাসপাতালে কোন নতুন রোগী আসলে যদি নিজের চেষ্টায় হাসপাতালে ভর্তি হতে পারছে না তখন তাঁকে ভর্তি করার ব্যবস্থাকরা , বেড প্রাপ্তিতে সহায়তা করা, হাসপাতালের কোথায় কি আছে, কি ধরনের চিকিৎসা পাওয়া যাবে, চিকিৎসা প্রাপ্তির নিয়ম-কানুন ,

হাসপাতালের নিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দেয়া। তাছাড়া ডাক্তার নার্সদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনসহ হাসপাতালের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে থাকে।

২. **কার্যকর চিকিৎসা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা ঃ** কোন রোগী হাসপাতালে ভর্তির পর রোগ নির্ণয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে একজন সামজকর্মী রোগের সাথে জড়িত সকল মনো সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলি উদ্‌ঘাটন করে চিকিৎসককে তাঁর চিকিৎসা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা ও প্রভাবিত করতে পারে। সমাজকর্মী রোগীর সাথে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথে কথাবার্তা বলে রোগের সাথে জড়িত বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ ও নিরাময় প্রক্রিয়াকে অর্থবহ করে তোলেন।

৩. **আর্থিক সহায়তা প্রদান ঃ** আমাদের দেশের বেশীর ভাগে রোগীই খুবই গরীব। অনেক সময় দেখা যায় রোগ নিরাময়ের জন্যে তাঁদের হাতে কোন অর্থ নেই। অথবা এমন কোন বড় ধরনের রোগ দেখা দিতে পারে, যার ব্যয়বহন করা রোগীর একার পক্ষে সম্ভব নয়। এ সব ক্ষেত্রে হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচি রোগীর ঔষধ পথ্য, বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষ নিরীক্ষার জন্যে বিনা মূল্যে করে দেন নতুবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা করে থাকেন। তাছাড়া রোগী কল্যাণ সমিতি গরীব রোগীদের চিকিৎসার জন্যে আর্থিক সহায়তা করে থাকে।

৪. **নিয়মিত ঔষধ সেবন ও খাদ্য গ্রহন ঃ** অনেক সময় দেখা যায় অশিক্ষিত রোগীরা ঠিকমত ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন বোঝেন না, তখন ১জন সমাজকর্মী তাকে কখন কোন কোন ঔষধ খেতে হবে তা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিন। আবার কোন কোন রোগের জন্য কি কি খাদ্য খেতে হবে, কোন কোন খাদ্য খাবে না তা বুঝতে পারে না এসব ক্ষেত্রে ১জন সমাজকর্মী রোগীকে নিয়মিত সেবা ঔষধ গ্রহন, খাবার গ্রহন এবং রোগের সাথে জড়িত সকল নিয়ম-কানুনগুলি সহজভাবে বুঝিয়ে দিয়ে থাকেন। আবার অনেক সময় ঔষধ থাকা সত্ত্বেও রোগী যখন নিয়মিত ঔষধ সেবন করে না তখন ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী সমাজকর্মী ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করেন।

৫. **চিকিৎসা গ্রহনের উপযোগী করে তোলা ঃ** যে সব রোগী মানসিক, সামজিক ও অভ্যাসজনিত কারণে চিকিৎসা সংক্রান্ত সাধারণ ও জটিল ব্যবস্থা (যেমন-অস্ত্রপাচার) গ্রহনে ভয় উৎকণ্ঠা কিংবা অসম্মতি প্রকাশ করে তাদেরকে মনো সামাজিক সমর্থন দিয়ে চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মী কার্যকর ভূমিকা পালন করেন।

৬. **যোগাযোগ রক্ষণাবেক্ষণ ঃ** দীর্ঘ মেয়াদী চিকিৎসার ক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী রোগীর আত্মীয়-স্বজনের কাছে চিঠি প্রদান, তাঁদের খুঁজ-খবর নিয়ে রোগীকে দিয়ে থাকেন। রোগীর সমস্যা ও অগ্রগতি সম্পর্কেও তিনি আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে থাকেন। তাছাড়া অনেকসময় আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে সার্বক্ষণিক রোগীকে দেখাশুনা সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে হাসপাতাল সমাজসেবার নিয়োজিত সমাজকর্মী দেখাশুনা করে থাকেন এবং রোগীকে প্রয়োজনীয় সেবা দিয়ে থাকেন।

৭. **চিকিৎসাত্তোর সেবাদান ঃ** চিকিৎসাত্তোর পর্যায়ে সেবা শুশ্রুষা ও বিশ্রাম লাভে সাহায্য করা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুর্নবাসন, প্রয়োজনে স্বাভাবিক জীবন নির্বাহের জন্য চশমা, ক্রাচ, হুইল চেয়ারের মত সামগ্রী সরবরাহ ইত্যাদি সহায়তা করে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় রোগীর রোগ নিরাময়ের পরে বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার পর রোগ সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকলে তার সাথে কেউ মিশতে চায়না সেক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মী বাড়ীর সদস্যদের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে ও রোগ সম্পর্কে ভূল ধারণা দূর করে থাকেন। তাছাড়া কেউ দীর্ঘদিন অসুস্থতার কারণে চাকুরী হারালো তাকে আবার পুনরায় একটি চাকুরীর ব্যবস্থা করতে সহায়তা দিয়ে থাকে। হাসপাতাল থেকে বাড়ীতে গিয়ে রোগী নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন অনূসরণ করছে কিনা নতুন কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা তার জন্যে রোগীর বাড়ীতে পরিদর্শন করতে যান ১জন সমাজ কর্মী উপরোক্ত দিকগুলো ছাড়াও আমাদের দেশে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা প্রদান পরিবার পরিকল্পনা গ্রহনে উৎসাহদান , কাপড় প্রদান শিশু স্বাস্থ্য, শিশু যত্ন, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি নিয়ে হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে থাকে। পরিশেষে বলা যায় যে, দৈহিক রোগের চিকিৎসার সঙ্গে রোগক্রান্ত ব্যক্তির আর্থ সামাজিক, পারিবারিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার চিকিৎসা ও সুস্থাতা আনয়নের লক্ষ্যে হাসপাতালে সমাজসেবার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত।

বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচির সমস্যা ঃ বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচি বর্তমানের যে সব সমস্যার সম্মুখীন তা হচ্ছে-

১) হাসপাতাল সমাজসেবায় নিয়োজিত সমাজকর্ম পেশায় শিক্ষিত চিকিৎসা সমাজকর্মী ছাড়া অন্যান্য অপেশাদার বিষয়ের হাসপাতাল সমাজকর্মী নিয়োগের ফলে তাদের দক্ষতার অভাব অত্যন্ত প্রকট। ফলে রোগীদের যথাযথ সেবাদান ও হাসপতাল সমাজসেবা কর্মসূচীকে কার্যকর করা যাচ্ছে না।

২) হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচী প্রশাসনিক জটিলতা ও দ্বিমুখী ব্যবস্তার সম্মুখীন। প্রতিটি হাসপাতালে হাসপাতালের নিজস্ব প্রশাসন রয়েছে অন্যদিকে হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচী পরিচালিত হয় সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে। হাসপাতালের প্রশাসনের সাথে সমাজসেবা প্রশাসনের সমন্বয় নেই। ডাক্তারগণ ও সমাজকর্মীকে মূল্য বা কাজের স্বীকৃতি দেন না। ফলে অনেক সময় কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

৩) সরকারের অপর্যাপ্ত সাহায্য সহযোগিতা এবং বেসরকারী সাহায্য সহযোগিতার অপ্রতুলতা চিকৎিসা সমাজকর্মের ফলপ্রসু সেবাদানকে অনিশ্চিত করে তুলছে। রোগীদের প্রয়োজনের তুলনায় আর্থিক সাহায্য খুবই অপর্যাপ্ত।

৪) চিকিৎসা সমাজকর্ম সম্পর্কে নীতি নির্ধারণী উধ্বর্তন মহলের সুস্পষ্ট ধারণার অভাবও এ প্রকল্পকে অর্থবহ করে তোলা যাচ্ছে না।

৫) চিকিৎসা ক্ষেত্রে হাসপাতালের সীমিত সুযোগ-সুবিধাও চিকিৎসা সমাজকর্মকে বাংলাদেশে সংকলপন্ন করে তুলছে।

৬) রোগিদের রোগমুক্তির পর আর্থিক ও সামাজিকভাবে পুর্নবাসনের সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম না থাকায় এদের কল্যান ও পুর্নবাসনে হাসপাতাল সমজসেবা কর্মসুচী অর্থবহ ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

৭) বেশিভাগ ক্ষেত্রেই একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী কে দেখা যায়, যোগাযোগ করা রোগিটিকে পৌঁছে দেয়া, আত্নীয় স্বজনের খোজখবর নেয় ইত্যাদি গুরুত্বহীন কাজে সময় ব্যয় করতে হয়। ফলশ্রুতিতে রোগ নিরাময়ের জন্যে যে কাজগুলি সম্পাদান করা প্রয়োজন আনুষঙ্গিক কাজে এত ব্যস্ত থাকতেহয় যে, সে দিকে মনোযোগ দিতে পারে না। এ জন্য হাসপাতাল সমাজসেবার স্টাফ বাড়ানোর প্রয়োজন।

অনুশীলনী

সম্ভাব্য প্রশ্ন উত্তর

১) হাসপাতাল সমাজ সেবা বলতে কি বোঝায়? হাসপাতাল সমাজসেবার উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করুন।

২) বাংলাদেশে প্রচলিত হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচির বিবরণ দিন।

৩) বাংলাদেশে প্রচলিত হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করুন।